বোমা পড়ে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীমনোজ বসু

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

বড় হয়ে তোমরা তোমাদের বাবার মতো বাংলা দেশে
গদ্যের ধারা অব্যাহত রেখো—এই আমার আশীর্বাদ ॥
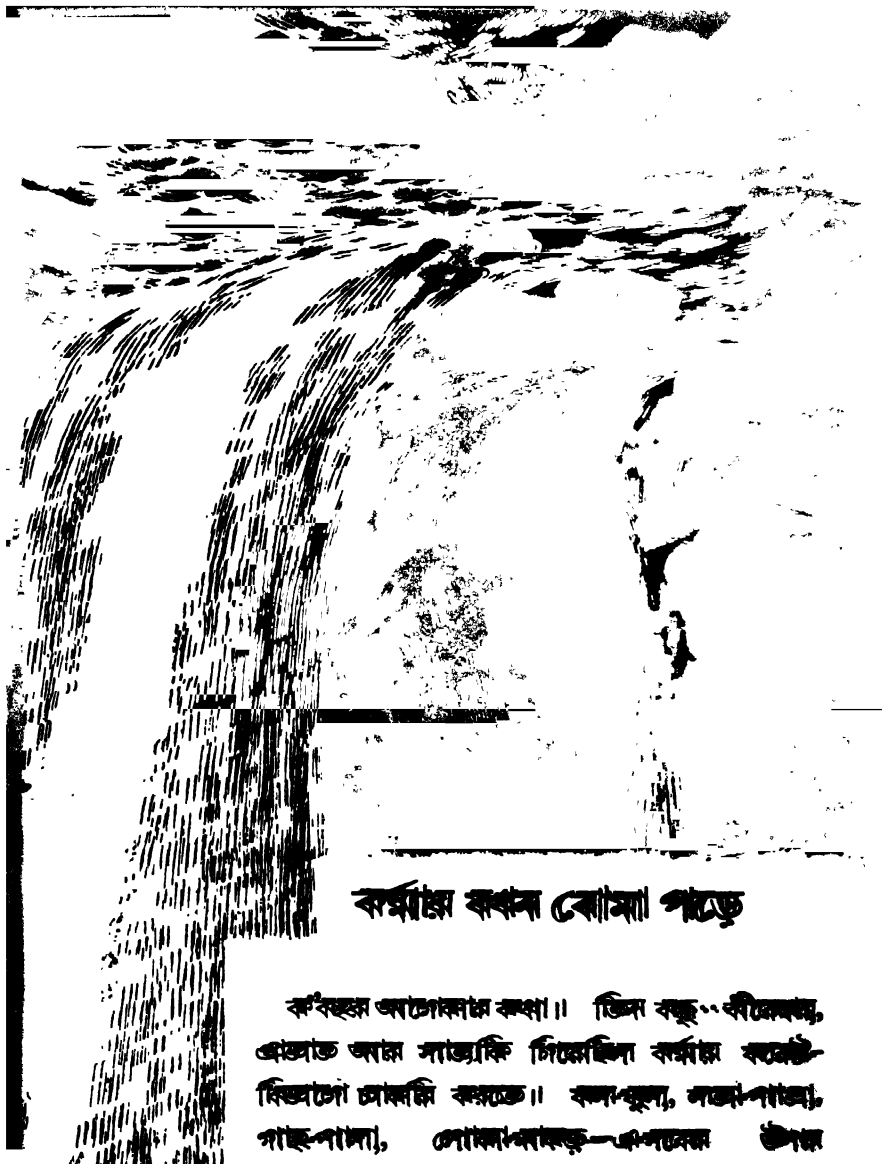
বর্মায় যখন বোমা পড়ছে

ক'বছর আগেকার কথা।। তিন বন্ধু··· বীরেশ্বর, প্রভাত আর সাত্যকি গিয়েছিল বর্মায় বটানি-বিভাগে চাকরি করতে।। ফল-ফুল, লতা-পাতা, গাছ-পালা, পোকা-মাকড়—এসবের উপর

[illegible]য় যখন [illegible] পড়ে
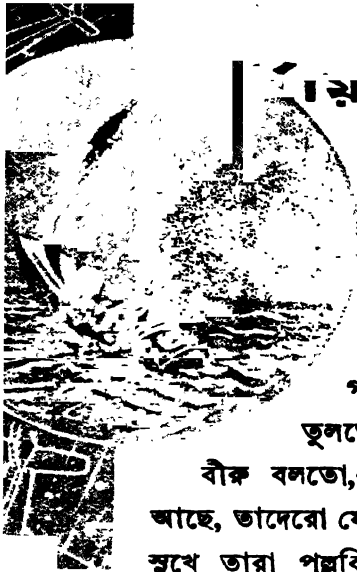
[illegible] ছিল প্রচণ্ড মোহ! উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ক'জনেই নানা বই পড়েছে। নাটক-নভেলে তিলমাত্র রুচি ছিল না; তাছাড়া বন-জঙ্গলের এত-রকম আষাঢ়ে গল্প তারা মজ্জাগত করেছিল যে সে-সব গল্প শুনিয়ে আমাদের প্রায় পাগল করে তুলতো!

বীরু বলতো,—জানো মুখুয্যে, গাছপালার যে প্রাণ আছে, তাদেরো যে সুখ-দুঃখ বোধ করবার শক্তি আছে,—সুখে তারা পল্লবিত হয়, দুঃখে মলিন সঙ্কুচিত হয়—এ সত্য স্যর জগদীশের আশীর্ব্বাদে আজ তোমরা হয়তো জেনেছো,—কিন্তু স্যর জগদীশ জন্মাবার বহু পূর্ব্ব থেকে নানা দেশে মানুষ এ-সত্য স্বীকার করেছে। নানা-দেশে গাছ-গাছড়ার পূজা প্রচলিত আছে, সে-পূজার রীতি-পদ্ধতিকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে না দিয়ে তার মর্ম্ম গ্রহণের চেষ্টা করো! আমাদের এখানে এই মনসা পূজা, বট-অশথের পূজা, ঘেঁটু-পূজা···এগুলো বাজে কুসংস্কার কিম্বা গাঁজা নয়—এ-পূজার অর্থ আছে—গভীর অর্থ!

বীরুর মুখের কথা লুফে নিয়ে সাত্যকি জের চালাতো,—এর অর্থ গ্রহণ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। বুঝলে, জ্ঞান বলো, আর শিক্ষা-সংস্কৃতি বলো, কাব্য-নাটকের রস-বিচারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়—তার ক্ষেত্র বিপুল এবং বিশাল।

এমনি মনোভাব তাদের সেই কিশোর বয়স থেকে।

প্রভাত বলতো,—বটগাছ আর ঐ অশথ গাছ···মানুষের সমাজে যেমন ব্যুরোক্রাট্ এ্যারিষ্টোক্রাট্ শ্রেণীর লোক আছে, উদ্ভিদ-সমাজেও তেমনি এ্যারিষ্টোক্রাট্ হলো ঐ বট-অশথের গাছ। কত বিপন্নকে আশ্রয় দিচ্ছে! অভ্যাস-বশে এ আশ্রয়-দান তার সহজাত হয়ে গেছে। মানুষের সমাজে যেমন অনেককে দেখি, কোনোকালে নিজের উপর নির্ভর করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, উদ্ভিদ-সমাজেও তেমনি দেখবে বহু-জাতের লতা আছে, পরের উপর নির্ভর না করে তারা বাঁচতে পারে না ইত্যাদি।

তিনজনেই বলতো,- বড় হয়ে দিক্‌দিগন্তে একবার ঐ উদ্ভিদ-রাজ্যের তত্ত্বানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বো। খবরের কাগজে খবর পড়ি, দুর্লভ গাছ-গাছড়া ফুল-পাতা-লতা সংগ্রহ করতে মানুষ চলেছে ঘনঘোর অরণ্যে···অথৈ সাগর পার হয়ে! কখনো উঠছে তুঙ্গ-গিরির মাথায়! ভয় জানে না, ডর জানে না! আমরাও তেমনি বেরুবো উদ্ভিদ-রাজ্য জয়ের বাসনায়—দুরন্ত অভিযানে।··

কাজেই তিনজনে ফরেষ্ট-বিভাগে চাকরি নিয়ে বর্মা যাত্রা করলে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নি!···

তারা গেল বর্মায়—আমরা দেশে বসে কেউ ধরলুম ওকালতির ব্যবসা
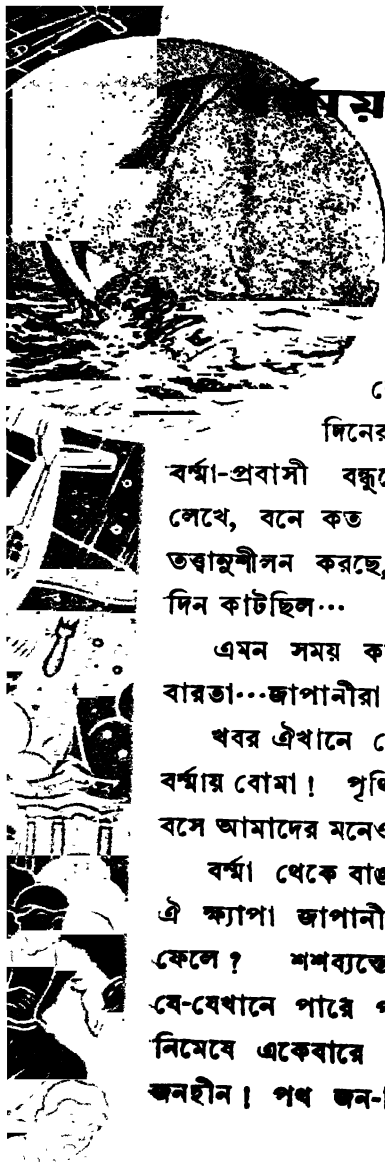
...য় যখন বোমা পড়ে

কেউ বা ডাক্তার হয়ে ষ্টেথেশকোপ পকেটে ফেলে রোগ খুঁজে খুঁজে পশারের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলুম ; কেউ বা ধরলো সনাতন রীতিতে চাকরি-বাকরি।

আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য নেই! রোমান্স নেই! রুটিনে-বাঁধা লাইন ধরে দিনের পর দিন কেটে চলেছে! মাঝে মাঝে বর্ম্মা-প্রবাসী বন্ধুদের কাছ থেকে চিঠি পাই। তারা লেখে, বনে কত কি এ্যাডভেঞ্চার ঘটছে, কত অদ্ভুত তত্বানুশীলন করছে, তারি বিচিত্র কাহিনী এমনি করেই সব দিন কাটছিল···

এমন সময় কাগজে রটলো, নিশার স্বপন-সম অত্যদ্ভুত বারতা···জাপানীরা করেছে সিঙ্গাপুর অধিকার!

খবর ঐখানে শেষ হলো না। আবার বেরুলো খবর··· বর্ম্মায় বোমা! পৃথিবী যেন দুলে উঠলো! বাঙ্‌লা দেশে বসে আমাদের মনেও ভয়-সংশয়ের বিপর্য্যয় দোলা লাগলো।

বর্ম্মা থেকে বাঙ্‌লা দেশ কতটুকুন্ বা পথ! শেষে যদি ঐ ক্ষ্যাপা জাপানীর দল এসে এই বাঙ্‌লা দেশে বোমা ফেলে? শশব্যস্তে সকলে সহর কলকাতা ত্যাগ করে যে-যেখানে পারে পলায়নোদ্যত হলো। কলকাতা-সহরে নিমেষে একেবারে ওলোট-পালোট ঘটে গেল! হাট-বাজার জনহীন! পথ জন-বিরল। বাড়ী-ঘর ফাঁকা, সদরে তালা।

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

টাকার শিকলে যাদের হাত-পা বাঁধা, তারাই শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর রেখে সহরের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। বুকে কিন্তু দপ্‌দপানির বিরাম নেই নিমেষের জন্য! মুখে বুলি,—রাখে কেষ্ট, মারে কে!

তারপর সাইরেনের ভোঁ,—এ-আর-পীর ধমক, আলো নিবোও—শেষে কলকাতার বুকের উপরও একদিন হয়ে গেল বোমা-বর্ষণ!

সে-ভয় কাটিয়ে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা-চিন্তায় আমরা আকুল, এমন সময় বীরু এসে হাজির! রৌদ্র-দগ্ধ মলিন-মূর্ত্তি! চেহারা দেখে মনে হয়, ক'বছরে তার বয়স যেন বিশ বৎসর বেড়ে গেছে!

বললুম—তারপর? বর্ম্মা থেকে পালিয়ে এসেছো?

বীরু বললে,—পালানো বলে পালানো! সে এক কাহিনী! তার কাছে কোথায় লাগে তোমার কাব্য-পুরাণ! মহাভারত তো অষ্টাদশ পর্ব্ব মাত্র! আর আমাদের পলায়ন-কাব্য—এর পর্ব্বের আর সংখ্যা হয় না!

বীরেশ্বরের সেই কাহিনী আজ তোমাদের শোনাতে বসেছি।
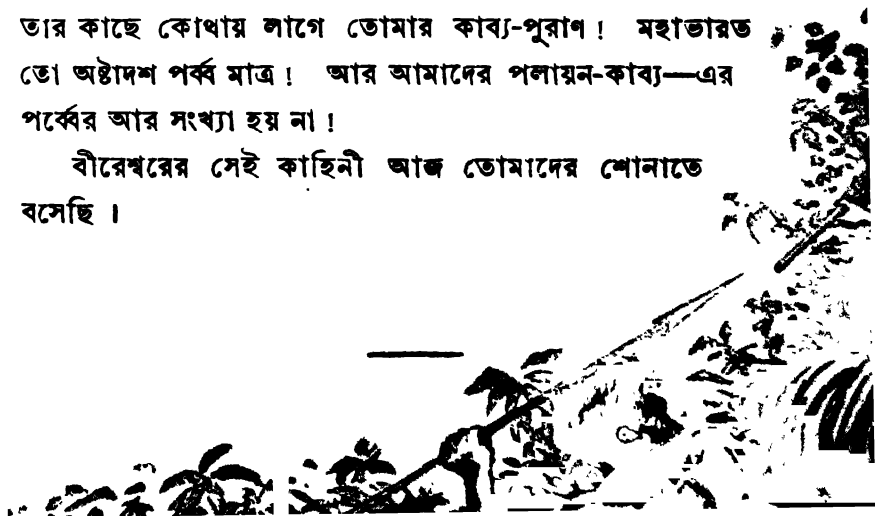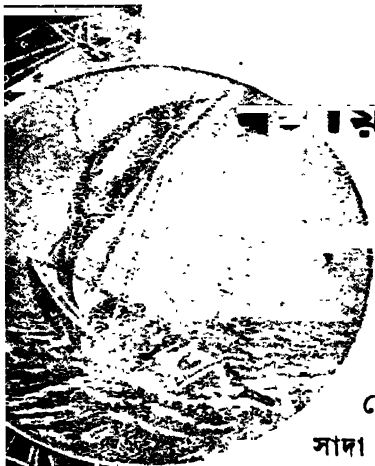
ব[illegible]ায় যখন বো

প্রথম পরিচ্ছেদ

বীরেশ্বর বলতে লাগলো ঃ

সিঙ্গাপুর পার হয়ে জাপানের বোমা শেষে বর্ম্মায় এসে পড়লো। সাইরেনের ভেঁপুতে যে-সঙ্কেত জাগলো, তাতে বর্ম্মার সাদা আর আমাদের কালা-ভারতীয় সমাজ বর্ম্মা-ত্যাগের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ-বহ্নির মতো এ-সংবাদ দিকে দিকে রটে গেল যে, বর্ম্মীজদের বিশ্বাস করো না—তারা নাকি জাপানী-দলে যোগ দেছে... লুকিয়ে লুকিয়ে জাপানীদের সাহায্য করছে! সুখের সংসার পেতে প্রচুর আসবাব-পত্র এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সাজিয়ে নির্বিকার শান্তিতে সকলে বাস করছিল, এ বিপত্তি-চক্রে সকলের প্রাণ একেবারে উড়ে গেল! যে যে-জিনিষ পারে, গুছিয়ে নিয়ে ধনপ্রাণ-রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্ম্মা ছেড়ে ভারতের পথে পাড়ি সুরু করে দিলে। জাহাজে ঠাঁই নেই, তার উপর জলের বুকে সাবমেরিণ, মাথার উপর বোমার ভয়— কাজেই বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গে বেশীর ভাগ লোক হাঁটা পথকেই অবলম্বন করলো। লোকের পর লোক চলেছে...পিঁপড়ের সার চলেছে যেন! ছেলেবেলায় পিঁপড়ের পরিপুষ্ট দল এবং সে-দলের অবাধ গতি দেখে আমরা চমৎকৃত হতুম, বিস্মিত হতুম। এই ভীত পলাতক জনশ্রেণীর কাছে

পিপীলিকার সে-সার যে কতখানি তুচ্ছ, নগণ্য বোধ হলো, সে কথা বলবার নয়!

আমরা তিনজনে তখন রেঙ্গুন সহর থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে উত্তর-দিকে এক গভীর জঙ্গলে ছিলুম। সে-জঙ্গলেও বর্ম্মার দারুণ প্রমাদের সংবাদ গিয়ে আমাদের সচকিত করে তুললো। আমাদের সঙ্গে ছিল অসংখ্য ভারতীয় কুলী। এ সংবাদ পেয়ে তারা আর একটি মিনিট অপেক্ষা করতে রাজী হলো না—তখনি ডেরা-ডাণ্ডা তুলে পলায়নোদ্যত হলো।

কিন্তু সে-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে রেলে চড়ে রেঙ্গুনে আসা—তারপর ভারতের পথে যাত্রা—এ-পর্ব্বে আমাদের মন সায় দিতে পারলো না। এ-পাড়িতে অনর্থক যে-সময় নষ্ট হবে, হয়তো সে-সময়ের মধ্যে রেঙ্গুন ফর্দ্দা-ফাঁই হয়ে যাবে!

আমরা ক'বন্ধুতে স্থির করলুম, জঙ্গলে আছে নদী—হো নদী। সেই নদীর বুকে আমাদের ছোট একখানা মোটর লঞ্চ ছিল। কাছাকাছি কোথাও যাতায়াত করতে এই মোটর-লঞ্চখানি ছিল আমাদের মস্ত সহায়। আমরা স্থির করলুম, ঐ মোটর-লঞ্চে চড়ে নদীর বুক বয়ে যতদূর পারি, ভারতের পথে এগিয়ে যাবো।

এই সংকল্প নিয়ে আমরা তিনজনে মোটর-লঞ্চে চড়ে যাত্রা সুরু করলুম। লঞ্চে আমাদের সঙ্গে আর-একজন সহযাত্রী জুটলেন। তোমরা তাঁকে চেনো। তাঁর
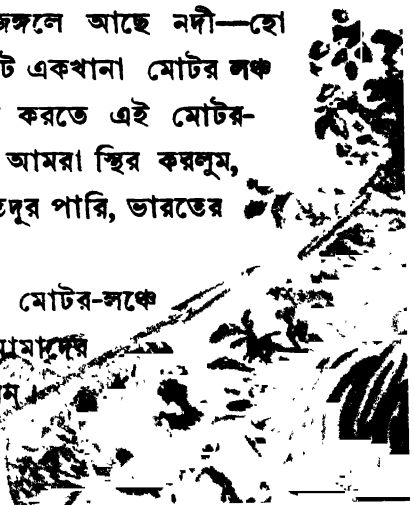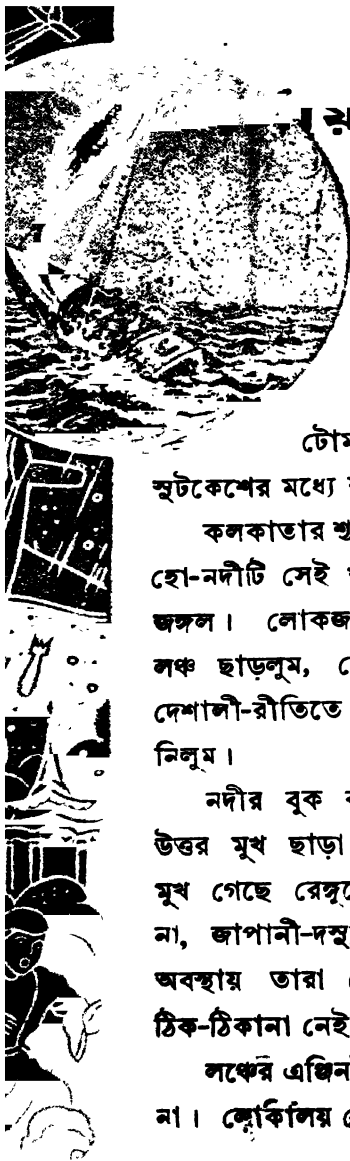
য় যখন বোমা পড়ে

নাম অনাথবাবু—তিনি ছিলেন আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার।

১৯৪২ মে-মাসের মাঝামাঝি আমরা লঞ্চ ছাড়লুম। লগেজের মধ্যে সঙ্গে রইলো এক বস্তা চাল, কিছু আনাজ-তরকারি, বিস্কুট, টিনে-ভরা ফল, মাছ, টোমাটো-সুপ, কম্বল, বিছানা; আর-একটা সুটকেশের মধ্যে কতকগুলো কাপড়-চোপড়।

কলকাতার শ্যামবাজার ছাড়িয়ে যে টালার খাল আছে, হো-নদীটি সেই খালের মতো। দু'ধারে উঁচু পাড়। পাড়ে ঘন জঙ্গল। লোকজনের বসতির চিহ্নমাত্র নেই! আমরা যখন লঞ্চ ছাড়লুম, বেলা তখন প্রায় দশটা। যাত্রার পূর্ব্বে দেশাজী-রীতিতে খিচুড়ি রেঁধে তাতেই উদর পূর্ত্তি করে নিলুম।

নদীর বুক বয়ে মোটর-লঞ্চ চললো সোজা উত্তর-মুখে। উত্তর মুখ ছাড়া অন্য-মুখে যাবার উপায় ছিল না। নদীর মুখ গেছে রেঙ্গুনের দিকে। সেদিকে যাওয়া নিরাপদ হবে না, জাপানী-দস্যু আছে, বর্ম্মীজ-দস্যু আছে! অরাজক অবস্থায় তারা যে কি করবে আর না করবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!

লঞ্চের এঞ্জিনটা যে খুব ভদ্র ছিল, এমন কথা বলা চলে না। লোকালয় ছেড়ে কবে তাকে আনা হয়েছে গভীর অরণ্য

বন্যা... যখন বোমা পড়ে

বয়ে এই নদীর বুকে...সম্পদে-বিপদে আমাদের সহায়, তবু তার দেহ অসুস্থ হলে চিকিৎসা হয় না, ঘোর দুরবস্থা! ছোটখাট ত্রুটি জানিয়ে বহুবার সে বিকল হয়েছে, কিন্তু বনের মধ্যে মিস্ত্রী কোথায় পাবো? আমরাই কখনো খোঁচা দিয়ে, কখনো তৈল-দানে তার বিকলতা ঘুচিয়ে আবার তাকে সচল করে তুলেছি। এমনি ভাবেই সে আমাদের সেবা করছিল।

মোটর-এঞ্জিন সম্বন্ধে প্রভাতের খানিকটা শিক্ষা ছিল। কোনো কারখানায় গিয়ে হাতে-কলমে সে এ-শিক্ষা লাভ করেনি; অর্থাৎ যাকে বলে, ঠেকে শেখা—সেইভাবে এ-বিদ্যায় তার যা-কিছু দখল জন্মেছিল।

দু'ঘণ্টা চলার পর খাল ছেড়ে আমাদের লঞ্চ একটা বড় নদীর বুকে এসে পড়লো। দুধারে কূলরেখা একেবারে নিবিড় শ্যামল তরুরাজিতে মসীবর্ণ হয়ে আছে। মাথার উপর দিয়ে দু' চারখানা এরোপ্লেন চলে গেল! বুক কেঁপে উঠলো! বোমাবর্ষী প্লেন এসে নদীর বুকে আমাদের লঞ্চ দেখে যদি একটি বোমাকোষ্ঠ্র নিক্ষেপ করে, তা হলেই সব কাবার!

ক'জনের কোষ্ঠীতে বোধহয় মৃত্যুযোগ ছিল না, কাজেই বুকে শুধু আতঙ্কের কাঁপন জাগিয়ে ও-প্লেন চলে গেল—যেন হেলা-ভরে কৌতুক করে গেল...বোমা ফেললো না!

প্লেন থেকে বোমা-বর্ষণ
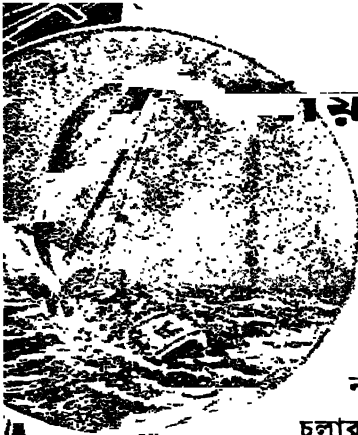
...য় যখন বোমা পড়ে

হলেও গৃহ-শত্রুর উপদ্রব ঘটলো! অর্থাৎ আমাদের মোটর-লঞ্চ নানারকম বদীয়তী স্বুরু করে দিলে—দুষ্ট ঘোড়া যেমন যেতে যেতে দুরন্তপনা করে, তেমনি! লঞ্চ প্রথমে তুলতে লাগলো প্রতিবাদসূচক নানারকম কাঁদুনি! সে-কাঁদুনিতে তার চলার অনিচ্ছা আমরা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করছিলুম। ভয় হতে লাগলো। সত্য যদি অচল হয়, তাহলে কূলে যে গভীর জঙ্গল দেখছি, ও-জঙ্গলে কোনো সাহায্য মিলবে না! উল্টে বরং...

প্রভাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তার ফলে ধক্-ধক্ করে' লঞ্চ একবার চলে, পরক্ষণে থামে। এমনি চলা-থামা এবং থামা-চলার মধ্যে হঠাৎ সে সম্পূর্ণ বিগড়ে একদম অচল হলো!

নদীর স্রোত চলেছিলো বিপরীত দিকে। কিন্তু জগৎ-পারাবারেও অচল স্থাণু হয়ে কেউ পড়ে থকেবে, এমন বিধি নেই! সচল জগৎ-পারাবার-স্রোতে তাকে চলতেই হয়! আমাদের অচল লঞ্চকেও নদীর স্রোত ঠেলে নিয়ে চললো উল্টো পথে। বীর-বিক্রমে ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে প্রভাত কোনোমতে সে-স্রোতের মধ্যেও লঞ্চকে ভিড়িয়ে কূলের কাছে নিয়ে এলো এবং তার নির্দ্দেশে মোটা কাছি নিয়ে সাত্যকি লাফিয়ে পড়লো ডাঙায়...লাফিয়ে জোর্‌সে কাছির ও-মুড়োটা সে

বেঁধে দিলে তীর-প্রান্তবর্ত্তী মোটা এক গাছের গোড়ায়। নদীর স্রোত পরাজয় স্বীকার করে একটা ঘূর্ণী-চক্রে বিরক্তির সুর ফুটিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল কোন্ অজানা দিকে। স্রোতের মুখ থেকে আমাদের তরী রক্ষা পেলো।

প্রভাত বললে,—এবার দেখা যাক, এঞ্জিনে কি হলো!

সাত্যকি বললে—ছাখো। আমি একটু উপরে উঠে দেখি, কোনো গ্রাম-ট্রাম আছে কি না!

ডাক্তার অনাথবাবু বললেন—শুনেছি, এ-সব বনে শান-সর্দ্দার লা-পুঙের বেজায় দাপট্! যে-ধারটায় আমরা থাকি, ও-ধারটা গণ্ডী টেনে সিপাহী-শান্ত্রী রেখে প্রোটেকটেড্ এরিয়া করা হয়েছে, সে-গণ্ডীর বাইরে কিন্তু দারুণ অরাজকতা, মশায়!

আমি বললুম,—ওদিকে বেলা পড়ে আসছে···ডাকাত না আসুক, বনভূমি কম্পিত করে জন্তু-জানোয়ার আসা বিচিত্র নয়।

সাত্যকি বললে—মাঝ-নদীতে কতক তবু নিরাপদ··· জন্তু-জানোয়ার হানা দিতে পারবে না।

প্রভাত বললে,—কিন্তু মাঝ-নদীতে বোট রাখা যাবে না তো···স্রোতে ভেসে কোথায় যাবো, ঠিক নেই। তার উপর কৃষ্ণপক্ষের রাত।

সাত্যকি বললে—সামনে-পি[illegible]

দু'দিকেই [illegible]

...য় যখন বামা পড়ে

মিলছে না, তখন আমার মনে হয়, উপরে উঠে একটু দেখা যাক, বসতি আছে কি না! তোমরা রাইফেল-বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকো। আমিও আমার রাইফেল নিয়ে উপরে উঠি।

তাই হলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে টর্চ্চ-লাইটের আলো ফেলে সাত্যকি ফিরে এলো তার অভিযান শেষ করে'। এসে বললে—না,··· কোনো গ্রাম আছে বলে এতটুকু সাড়া পেলুম না। অনেকখানি ঘুরে দেখে এলুম।

তেল-কালি মেখে গলদঘর্ম্ম হয়ে দু'হাত ছড়িয়ে প্রভাত বসে পড়লো। বেশ বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—অসম্ভব! তার উপর আলো নেই···কাজ করবো কি করে'?

মন ছমছম করে উঠলো···উপায়?

বার-বার মনে পড়তে লাগলো, যেদিন দেশ ছেড়ে বনের মায়ায় এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বেরিয়ে এসেছিলুম, সেদিন মনের কোণে এটুকু আশা রেখেছিলুম যে, ভয় কি! যেদিন জননী বঙ্গভূমির শ্যামল অঞ্চল-তলে আশ্রয় নেবার কথা মনে জাগবে, সেই দিনই ফিরে আসবো আবার আমার বাঙলা-মায়ের কোলে! তখন কে ভেবেছিল, দুরন্ত দৈত্যের মতো জাপান অতর্কিতে এমন সংহার-লীলায় মত্ত হবে! তাছাড়া

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

ব্রিটিশের অধিকারে বর্ম্মা! সে-বর্ম্মায় এমন বিপদ্ ঘটতে পারে, এ স্বপ্নের অগোচর! ওদিকে পাহারায় রয়েছে সিঙ্গাপুর… দুর্ভেদ্য দুর্গ! কিন্তু…

মনে ছম-ছমানির বিরাম নেই। মাথার উপর আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র এসে বসলো! এই নক্ষত্রদের নিত্য দেখ্ছি আকাশে…ওদের ও-দৃষ্টিতে কত আনন্দ, কত কৌতুক দেখেছি! কিন্তু আজ? আজ আমাদের জন্ত দুশ্চিন্তায় নক্ষত্রদের চোখের দৃষ্টি যেন একান্ত মলিন! আকাশচারী নক্ষত্র…আমাদের চোখে আমরা কতটুকুন্ বা দেখতে পাই! আকাশচারী নক্ষত্রের দৃষ্টি বহুদূরগামী…নক্ষত্ররা আমাদের ভবিষ্যৎ দেখে হয়তো আমাদের নিরুপায়তার কথা ভেবে দুঃখে আজ এমন ঝিমিয়ে রয়েছে! ওদের আলোয় চিরদিনের সে হাসির দীপ্তি কৈ?

এমনি নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে লঞ্চে বসে-বসে আমাদের রাত্রি কাটলো! কারো চোখে বিন্দু-বাষ্পে নিদ্রার ছায়া এসে নামলো না!
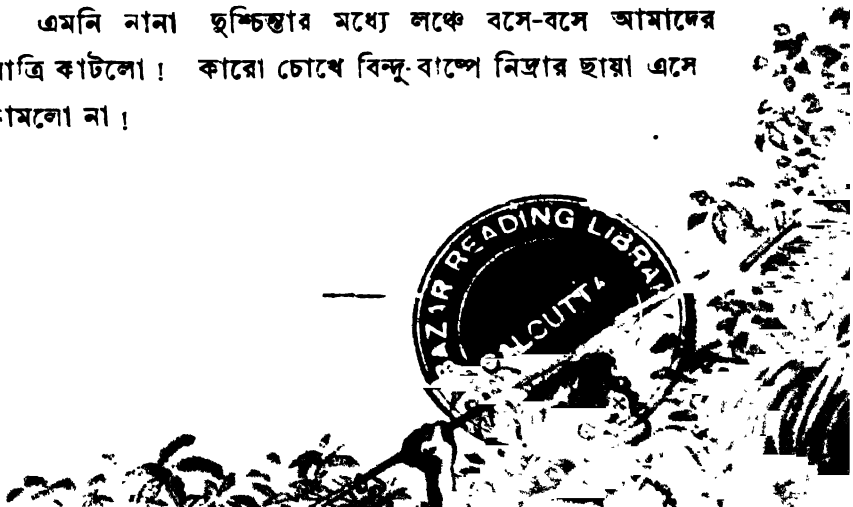
য় যখন বামা ড়ে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুঃখের রাত্রি-শেষে আবার ভোর হলো। ভোরের আলো এত ভালো আর কোনো দিন লাগে নি। ষ্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করে সেই চা-পান; সঙ্গে ছিল রুটি, ডিম···তাতে হলো প্রাতরাশ-সমাপন। খেয়ে প্রভাত আবার লাগলো এঞ্জিন নিয়ে অসাধ্য-সাধন-ব্রতে···অচল এঞ্জিনকে চালু করবার কাজে।

অনাথ ডাক্তার বললেন— এ-অঞ্চলের নাম জানেন?

আমরা বললুম—না।

অনাথ ডাক্তার বললেন—শন্-পা। এদিকটা ছিল শান্দের। ইংরেজ-রাজ কাছাকাছি রেঞ্জ খুলে বসার দরুণ তারা সরে গেছে।

আমি বললুম—কিন্তু এ-বনে ডাকাতি যে করবে···কার এমন সম্পত্তি আছে?

অনাথ ডাক্তার বললেন—ডাকাতি করে এখানে এসে শান্রা মালপত্র জমায়েৎ করতো। অনেকে বলে, এ-সব বনে তারা তোষাখানা তৈরি করেছিল। সুড়ঙ্গ কেটে গুহা বয়ে-বয়ে তার মধ্যে তোষাখানা। সেজন্য এ-সব বনের উপর তাদের পাহারাদারী এখনো মজুত আছে। বাইরের কোনো জাতের লোকের পক্ষে এ-সব বনে আসা তাই নিরাপদ নয়।

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

সাত্যকি বললে,—জাপানীদের ভয় আছে—তারা একেবারে বর্ব্বর দানব…কাকেও বাদ দেবে না! নাহলে বনে ঢুকে একবার আলিবাবার মতো চিচিং-ফাঁক বলে' শান্ ডাকাতদের তোষাখানার দোর খোলবার চেষ্টা করতুম।

আমি বললুম,—সে দুঃখ নাই বা রাখলে! করো না তোষাখানার সন্ধান। যে-জায়গায় এসেছি…এ-নিবিড় বনে জাপানীরা এসে তাড়া করবে বলে মনে হয় না। তাদের লক্ষ্য সহরের উপর আর বন্দরগুলোর উপর।

সাত্যকি বললে—ধন-রত্ন পেলে বনে থেকে লাভ নেই! সহরে যেতে হবে সে ধন-রত্নের সদ্ব্যবহার করতে বাবুগিরির জৌলুশে পাঁচজনের চোখ ধাঁধাতে! সহরে যাবার পথে যদি জাপানীর হাতে পড়ি, তাহলে? অর্থাৎ মাটীর বুক থেকে ধন-রত্ন তুলে তাদের হাতে সমর্পণ করবো?

এমনি কথায়-কথায় বেলা প্রায় বারোটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে সাত্যকি ষ্টোভের উপর এলুমিনিয়ামের পাত্রে চাল চড়িয়ে দিয়েছিল—ভাত হবে। তরকারীর মধ্যে ছিল আলু! আলু সিদ্ধ করে' নেবো, আর ডিম! ব্যস্!

বিকেলের দিকে গুরু-গুরু আওয়াজ তুলে এঞ্জিন জানিয়ে দিল, অল্ রাইট—তোমাদের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি! চলো বৎসগণ, তোমাদের নিয়ে আবার যাত্রা সুরু করা যাক্।
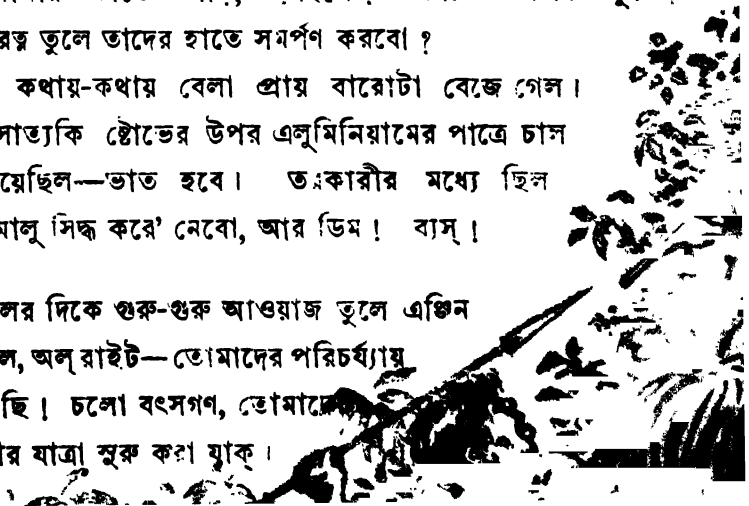
যখন বোমা পড়ে

লঞ্চ চললো···নদীর বুকের উপর দিয়ে দু'ধারে জঙ্গলের কেয়ারি ভেদ করে। ক্যাম্পে পেট্রোলের যতগুলো টিন ছিল,—বিশ-বাইশটা—সব আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। কাজেই নন্-ষ্টপ গতিতে লঞ্চ চালানো হবে। এ-নদীতে বাধা-বিপত্তির ভয় নেই। দিন-রাত চলবে—ক'জনে মিলে সে সম্বন্ধে এক-মত! সহর-ত্যাগেন দুর্জ্জন···সে কাজ যত দ্রুত সারা যায়।

চতুর্থ দিনে আমাদের লঞ্চ এসে পড়লো মস্ত চওড়া ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর। অগাধ অসীম জলের রাশি! যেমন স্রোত, মাঝে মাঝে তেমনি এক-একটা ঘূর্ণীচক্র···ঘুরছে অজগরের ফণার মতো! শুনেছি, ব্রহ্মপুত্রের বুকে এ-সব ঘূর্ণীচক্র মৃত্যুর দূত! ওর কবলে পড়লে কারো সাধ্য নেই রক্ষা পাবে! প্রভাতকে সকলে মিলে হুঁশিয়ার করে দিলুম—সাবধান! জাপানী বোমার আগুনে মারা গেলে হয়তো হিষ্ট্রীর পাতায় নাম লেখা থাকবে! তাদের বোমার হাত থেকে ত্রাণ পেতে যেন ব্রহ্মপুত্রের রোষচক্রে প্রাণগুলো না নষ্ট হয়, বন্ধু!

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

পাকা মাঝির মতো প্রভাত বললে,—চুপ করে থাকো সকলে। কোনোরকম টীকা-টিপ্পনিতে আমাকে অন্তমনস্ক করো না! মানে, সত্যি যদি বাঁচতে চাও···

সেদিনটা মন্দ কাটলো না! জলের বুক বয়ে অগ্রসর হয়ে অনেকখানি এগুলুম। নদীর দুই তীর এক-এক জায়গায় জলের বিরাট উচ্ছ্বাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল—আবার ক্ষণে ক্ষণে দেখা যেতে লাগলো ধুতির মিহি সরু পাড়ের মতো—অতিশয় ক্ষীণ রেখায়!

এঞ্জিন বেশ খুশী হয়ে চলেছে। বহু বিচিত্র ধ্বনিতে তার আনন্দ জাগছিল···ওস্তাদ-গায়কের ধুয়ার মতো! বিকল হবার কোনো লক্ষণ পাচ্ছিলুম না।

লঞ্চ চলার মধ্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন চলেছিল প্রয়োজন-মতো। মাথার উপর এপর্য্যন্ত জাপানী বা ব্রিটিশ-প্লেনের ঘর্ঘর-নাদ শ্রুতিগোচর হয়নি!

রাত্রে আমার চোখ নিদ্রায় এমন জড়িয়ে এলো যে কার সাধ্য আমাকে জাগিয়ে রাখে! অনাথ ডাক্তার শুধু চিকিৎসা-বিদ্যা জানেন না—গানে তাঁর চমৎকার গলা! তিনি গান ধরেছিলেন:

'অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া···'

তাঁর গান শুনতে শুনতে আমি হেসে বসে নিদ্রাভিভূত হলুন।
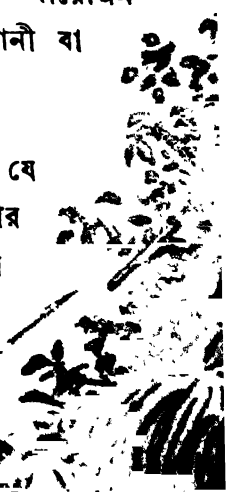
ঘুম ভাঙ্গলো ঝড়ো-বাতাসের হা-হা অট্টহাস্য-রবে! তার সঙ্গে মিশেছিল জল-তরঙ্গের ভীম-ভৈরব নাদ! তরঙ্গের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে জামা-কাপড় ভিজে একশা—লঞ্চ দুলছে যেন মোচার খোলা! আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই! কে যেন রাজ্যের আলকাৎরা ঢেলে চাঁদ-তারা—সব একেবারে ধুয়ে মুছে দেছে! আমার পাশে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে সাত্যকি। তাকে বললুম,— ভয়ঙ্কর ঝড়!

সাত্যকি বললে—হুঁ...ডাঙ্গার দিকে কোনোমতে এগুনো যাচ্ছে না।

হঠাৎ এঞ্জিন গেল থেমে...অমনি মস্ত একটা ঢেউ লাফিয়ে লঞ্চের উপর এসে পড়লো। আমাদের ঠেলে নিয়ে যাবে যেন ব্রহ্মপুত্রের বুকে! কোনোমতে খুঁটি-ডাণ্ডা ধরে লঞ্চে নিজেদের আটকে রাখলুম! ঝড়ো-বাতাস উত্তর-দিক থেকে নেমে তেড়ে-তেড়ে আসছে আমাদের গায়ের উপর—নদীর সঙ্গে চলেছে আকাশের বিপর্য্যয় বিরাট সংগ্রাম! সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার!

ভয়ে আমরা কাঁপছি! চুপচাপ বসে বসে ভাবছি, এবারকার ঢেউটা খুব সামলেছি! কিন্তু এর পরেরটা? সাদা ফেনার কুণ্ডলী তুলে ঐ তেড়ে আসছে! ওর গ্রাস থেকে আর রক্ষা নেই!

বর্মায় যখন বোমা পড়ে

তবু রক্ষা পেলুম! কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে, জানি না!

বড় বড় লেখকদের লেখায় পড়ি, অতি বড় দুর্দ্দিনেরও সমাপ্তি ঘটে···কাল-রাত্রিও পোহায়! সেকথা কতখানি সত্য, তা উপলব্ধি করলুম পরের দিন সকালে।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মতন অদৃশ্য হয়ে গেলো—নদীর জলে তরঙ্গ নেই···শুধু প্রখর একটানা স্রোত! লঞ্চের এঞ্জিন কিন্তু বন্ধ! স্রোতের মুখে লঞ্চ ভেসে চলেছে···কম্পাস দেখে বুঝলুম, পশ্চিম-মুখে। শুধু এই ভেবে আশ্বস্ত হলুম, যে, পশ্চিম-দিক্‌টা বেদিক নয়!

প্রভাতের কিন্তু নিস্তার নেই! এঞ্জিন নিয়ে তার ধস্তাধস্তি চলেছে সমানে! অনাথ ডাক্তারের কাছে হাত-ঘড়ি ছিল! ঘড়ি দেখে সাত্যকি বললে—বেলা সাড়ে-সাতটা।

স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে লঞ্চ চললো তীরের দিকে এবং দেখতে দেখতে ঠেকলো চওড়া একটা চড়ার গায়ে। নেমে ঠেলাঠেলি করে' লঞ্চকে এমনভাবে চড়ায় আটকে রাখা হলো, যাতে সে না নড়ে। তারপর সকলে মিলে যথাসাধ্য এঞ্জিনীয়ারিংয়ের প্রয়াস!

সারা সকালটা এঞ্জিনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটলো··· হাঁটুপর্য্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে। সে কী যুদ্ধ! দু'হাতে ফোস্কা পড়লো···ঘামে সর্ব্বাঙ্গ গেল ভিজে···[illegible] পরিশ্রম! শেষে ক্লান্ত নিরুপায় হয়ে চুপ চাপ সব লঞ্চে চড়ে বসে র[illegible]।

ময় যখন বামা পড়ে

তারপর কে এসে যে এঞ্জিনকে দিল ধাক্কা, ভগবান্ জানেন! হঠাৎ সেই সুমধুর ধ্বনি! সঙ্কেত! মানুষের নাড়ীর স্পন্দনে যেমন তার প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এ-ধ্বনিতে বোঝা যায় তেমনি এঞ্জিনের মুমূর্ষু দেহে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে! প্রোপেলর টানা হলো···সাত্যকি আর আমি দাঁড় ধরে বসলুম···অনাথ ডাক্তার বললেন,—ভাঁজ খুলে একখানা বিছানার চাদর খাটিয়ে দাও পালের মতো! তারপর সেই গান ধরি···

ভাঙ্গিয়া ফেলেছি হাল, বাতাসে পূরেছি পাল,
স্রোতমুখে প্রাণ-মন যাক্ ভেসে যাক্!

সেই সুরে ভেসে চলবে আমাদের সাধের তরণী!

অনাথ ডাক্তারের কথা শিরোধার্য্য করে বিছানার চাদর খাটানো হলো, এবং চালু এঞ্জিনকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে লঞ্চ ঠেলে চড়ার বাইরে জলে ভাসানো হলো। লঞ্চ চললো ভেসে ···পালে বাতাস পেয়ে তার জোরে! হাল, দাঁড় এবং ষ্টীয়ারিং —এই ত্রি-শক্তিতে ভর করে' আমাদের তরী আবার ভাসলো!

একটু আগে স্বচ্ছ জলের নীচে দেখি, রূপালি আলো! অনাথ ডাক্তার চীৎকার করে' উঠলেন—হাঙর!

সকলে শিউরে উঠলুম! ভাগ্যে উনি আর একটু আগে

আমাদের উপস্থিতি জানতে পারেননি ! জানলে চড়ায়
হাঁটুভোর জলেই যে আমাদের শিকার করে বসতেন, সে-ক
অস্বীকার করবার জো নেই !

একটু এগিয়ে বাঁয়ে আবার এক খাল পেলুম। কা
ছিল ম্যাপ্। ম্যাপ্ দেখে নিশানা জানা গেল—এ-খালে
নাম লুমীনা। এ-খাল গেছে একেবারে সেই ভারত মহা
সাগরের মুখে।

আবার যদি ঝড় ওঠে? ব্রহ্মপুত্র নিরাপদ হবে না ভে
আমরা সেই লুমীনা খালে ঢুকলুম।

পাল গুটিয়ে আবার এঞ্জিনে নির্ভর রেখে অগ্রসর হলুম
ক্ষুধা-পিপাসার কথা মনে ছিল না। জলের অথৈ প্রসার দেখে
ভয়ে সে-চিন্তা যেন উবে গিয়েছিল! এখন খালের টান
গণ্ডীর মধ্যে ধড়ে প্রাণ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা-পিপাসার
কথা মনে জাগলো !

সাত্যকি বসলো ষ্টীয়ারিং ধরে। কি করতে হবে, আধ-
ঘণ্টা ধরে পাখী-পড়ানোর ভঙ্গীতে প্রভাত তাকে উপদেশ
দিয়ে তৈরি করে নিলে এবং আমরা মনোনিবেশ করলুম
ভোজ্য-রচনার কাজে।

সাত্যকি বললে—সত্যি, খিদে যা পেয়েছে,
বলবার নয়।

প্রভাত বললে,—হুঁ।
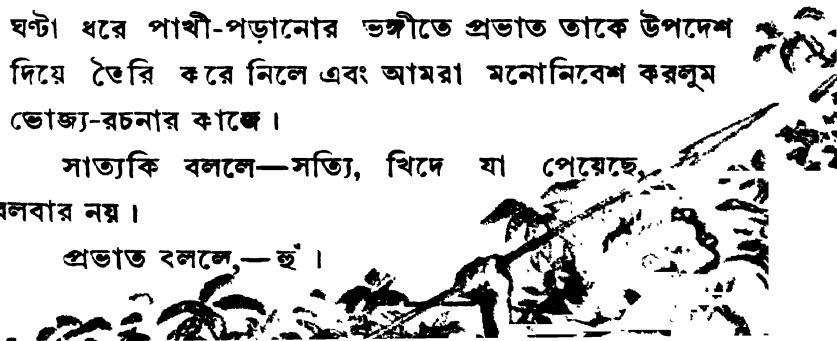
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় তিনটে···আহারাদি সেরে পালা করে বিশ্রাম করছি—হঠাৎ কিসের সঙ্গে সজোরে লাগলো লঞ্চের ধাক্কা। সকলে চমকে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ স্থানভ্রষ্ট।

কিসে ধাক্কা লাগলো, বুঝতে পারলুম না। হয়তো জলের বুকে ছিল চোরা-পাহাড় কিম্বা গাছের গুঁড়ি! সে-বস্তু দেখবার অবসর মিললো না! ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, এঞ্জিনের তলা ফুঁড়ে হু-হু বেগে লঞ্চের মধ্যে জল ঢুকছে!

প্রমাদ গণলুম! জিনিষপত্র যে যা পারি, তুলে তীর লক্ষ্য করে ছুড়তে লাগলুম। হাতের তাগ মন্দ ছিল না এবং তীরও বহুদূরে ছিল না! তবে খালে অগাধ জল। সাত্যকি বললে—সকলে মিলে ছেঁচে লঞ্চের জল বার করি।

প্রভাত বললে—সে কাজ না করে রশদ সামলাও আগে!

'প্রভাতের কথাই ঠিক! কারণ লঞ্চের তলা যদি ফুটো হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রত্যাশা মিথ্যা হবে! বুঝলুম, চরণযুগলকে আশ্রয় করে এবার প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা—নচেৎ কারো সাধ্য থাকবে না, আমাদের রক্ষা করে!

জিনিষপত্র সব প্রায় তীর-জাত করা হলো। লঞ্চের অর্দ্ধ-অঙ্গ তখন জলে, বাকী অর্দ্ধ উপরে! আমরা ঝাঁপ খেয়ে

জলে পড়লুম। সন্তরণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ভয় হলো, ওদিককার সেই হাঙর-প্রবর যদি আমাদের সঙ্গ নিয়ে এখান পর্য্যন্ত এসে থাকে?···কিন্তু তার ভয়ে চুপ করে থাকা চলে না! সাঁতার কেটে তীরে উঠে বাঁচবার চেষ্টা চাই! জলে নামলুম।

জলে কি প্রখর স্রোত! কোনোমতে তীরের কাছাকাছি এলুম। তীরে উঠবো, কিন্তু ভীষণ কাদা! হাঁটু পর্য্যন্ত সে কাদায় ভস্-ভস্ করে ডুবে যায়। মরণের সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম চললো··পিছনে অনাথ ডাক্তার চীৎকার করে উঠলেন—আমি গেলুম!

চেয়ে দেখি, তাঁর বুক পর্য্যন্ত কর্দ্দমে নিমগ্ন এবং যত তিনি ওঠবার চেষ্টা করছেন, ততই পাতাল-গর্ভে তাঁর অবতরণের মাত্রা বেড়ে চলেছে!···

প্রভাত ডাঙ্গায় উঠেছিল···তার সঙ্গে ছিল দুখানা দাঁড়! সেই দাঁড় সে দিল নামিয়ে···আমি দাঁড় ধরলুম। আমার পা তখন কঠিন জমিতে আশ্রয় পেয়েছে, কাজেই ডোববার ভয় ছিল না। সে-দাঁড়ের একটা দিক আমি বাড়িয়ে দিলুম অনাথ ডাক্তারের দিকে। তিনি প্রাণপণে দাঁড়ের সেই দিকটা আঁকড়ে ধরলেন। তারপর সকলে মিলে হেঁইয়ো-জোয়ান্-হেঁইয়ো করে' দে টান্!

বিশ-পঁচিশ মিনিটের টানাটানিতে হলো অনাথবাবুর উদ্ধার-সাধন
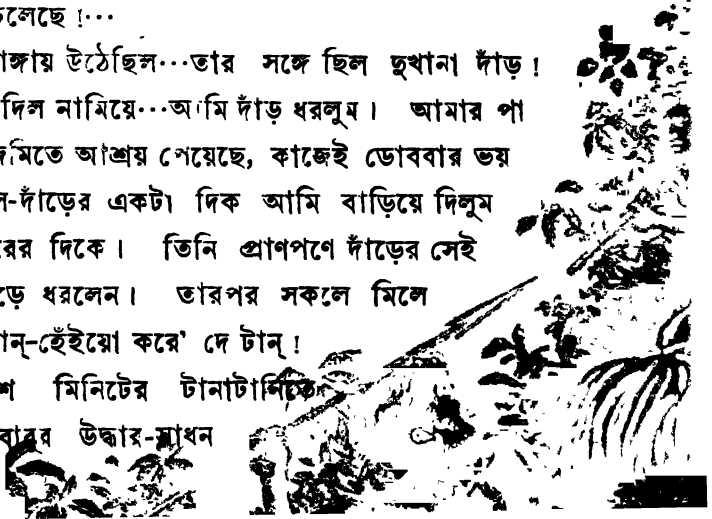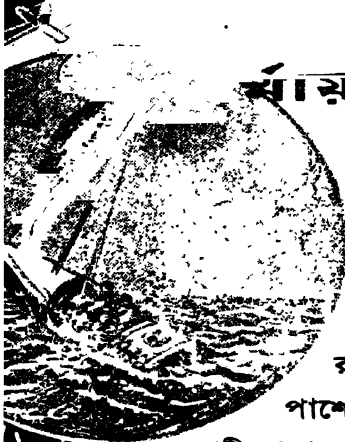
ঝাঁয় যখন বামা পড়ে

কিন্তু ডাঙ্গায় এসে ক্লান্তি-ভরে তিনি একেবারে শুয়ে পড়লেন। যাকে বলে, মূর্চ্ছা !...

কোথায় ডাক্তার-মানুষ এ-বিপদে আমাদের রক্ষা করবেন—তা নয়, তাঁকে রক্ষা করতে হবে ! রোজা রোগী হলে আশে-পাশে আর-সকলের অস্বস্তি ঘটে কতখানি, ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে তা বুঝবে না।

মূর্চ্ছা ভেঙ্গে অনাথ ডাক্তার যখন স্বস্তি লাভ করলেন, বেলা তখন পাঁচটা। সূর্য্য পশ্চিম আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। কালো কালো একরাশ মেঘের টুকরো কোথা থেকে ভেসে ভেসে এসে আমাদের মাথার উপর আকাশের বুকে জড়ো হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন আমাদের দুরবস্থা দেখে তারা সুগভীর চক্রান্ত করে মাথার উপর এসে জমছে—সম্মিলিত শক্তি নিয়ে আক্রমণে আমাদের এবার চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে বলে' !

চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, সুগভীর অরণ্য ! তার কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই ! ওর মধ্যে যেন পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার এসে আস্তানা নেছে ! পৃথিবীর বুকের কোনো কোণে যেন অন্ধকারের বিন্দুও আর পড়ে নেই ! চারিদিকে নিরন্ধ্র বন, নীচে খরস্রোতা নদী, মাথার উপর ঘন কালো মেঘ এবং সামনে রাত্রি ! লোকে কথায় বলে, ত্র্যহস্পর্শ-যোগ ! আমাদের

বর্ষায় যখন বাসা পড়ে

ভাগ্যে ত্র্যহস্পর্শ নয়, চতুস্পর্শ-যোগ! কাল সকালে আর সূর্য্যোদয় দেখা ভাগ্যে ঘটবে না! নিরুপায় হতাশার ভারে দেহে-মনে এমন অবসাদের সৃষ্টি হলো যে সকলেই একবাক্যে স্থির করলুম, বৃথা 'চেষ্টা! মৃত্যু আসন্ন! মিথ্যা তার সঙ্গে যুদ্ধং দেহি বলে হাত-পা ছোড়ার কশরতি! নিঃশব্দে মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া গতির্নাস্তি!

নিরুপায় নিশ্বাস ফেলে সূর্য্য অস্ত গেলেন। বোধ হয়, আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে তিনি আর থাকতে পারলেন না! তিনি বিদায় নেবামাত্র মেঘের দল সুরু করে দিল প্রমত্ত আস্ফালন। জঙ্গল থেকে মশার অক্ষৌহিণী বেরিয়ে এলো ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে দলে দলে! দু'চারশো রেজিমেণ্টের মতো! সবেগে তারা বেরুতে লাগলো! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি প্রাণী। তাদের সে উল্লাস-গুঞ্জন···আমাদের মনে হতে লাগলো, একেই বলে বুঝি, কাল-ভৈরবের প্রচণ্ড নাদ! নদীর বুকে হাঙরের মুখ থেকে বেঁচে এসে শেষে জঙ্গলের এই দুরন্ত মশার দংশনে বুঝি প্রাণগুলো যাবে!

সাত্যকি বললে,—জ্বালো আগুন······যাকে বলে, যজ্ঞানল। দেখি, মশার দল তাতে হঠে কি না।

কাঠকুটোর অভাব ছিল না। সঙ্গে স্পিরিটের বোতল। স্পিরিটে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তাতে দিলুম আগুন। এবং সেই মশালের সাহায্যে জ্বলে উঠলো যজ্ঞের
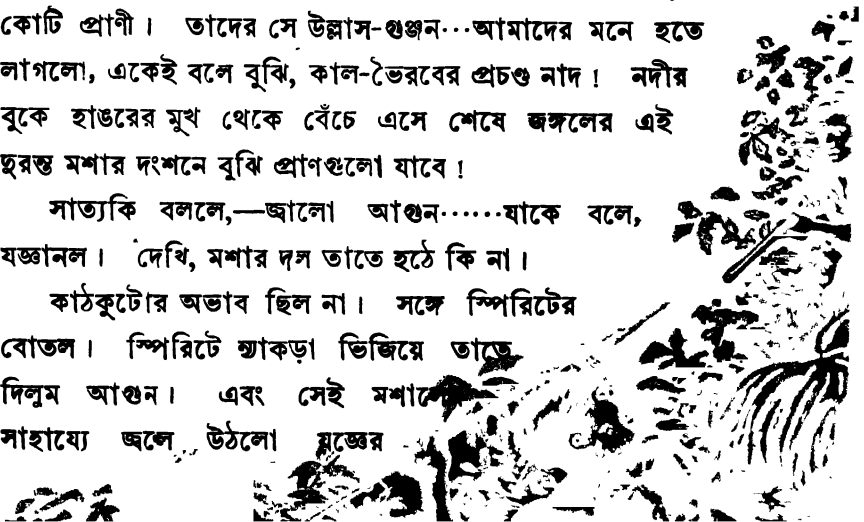
...য় যখন বোমা পড়ে

অনল! মহাভারতের জন্মেজয় রাজা করেছিলেন সর্প-যজ্ঞ, আমরা করতে বসলুম মশা-যজ্ঞ—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা!

তবু কি মশার দল হঠে! আগুনের তীব্র আলোয় চেয়ে দেখি, কাতারে কাতারে মশক-অক্ষৌহিণী! ও-ধারটা জঙ্গলে ভরে আছে, না, মশার ঝাঁকে, বলা শক্ত! প্রভাত ক্ষেপে উঠলো···বললে—বনে আজ আগুন লাগাবো! যদি মরি, সেই দাবানলে দগ্ধ হয়ে মরবো! মশার কামড়ে মরে' পৃথিবীর বুকে কলঙ্ক রেখে যাবো না।

দাউ-দাউ করে জ্বল্‌লো বনের গাছপালা। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম ব্যাপার দেখে। গাছে গাছে কে যেন গন্ধক মাখিয়ে রেখেছিল, আগুনের ছোঁয়া লাগবামাত্র দিকে-দিকে এমন লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করলো অগ্নি··· সে দৃশ্য কল্পনাতীত!

আগুনের দৌলতে মশার হাত থেকে কোনমতে আত্মরক্ষা করে উঠলুম, আগুন কিন্তু ছাড়ে না! যেদিকে যাই, সে-ও যায় তাড়া করে'! মনে হলো, যে-আগুন নিজেদের হাতে জ্বেলেছি, শুধু বনের গাছপালা গ্রাস করে তার তৃপ্তি হবে না, আমাদেরও গ্রাস করবে! .

ভয় হলো! সাত্যকি বলেছিল, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরবো···

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

মনে হলো, ভগবান বুঝি অদৃশ্য থেকে তার এ-কথা শুনে সাত্যকির প্রার্থনা-পূরণে অভিলাষী হয়েছেন! হয়তো অগ্নি-দাহে ছাই হতুম—কিন্তু মাথার উপর যে কালো মেঘের দল দৈত্য-বালকদের মতো জড়ো হচ্ছিল, তারা বনের বুকে আগুনের লীলা-নৃত্য দেখে হিংসায় আর সহ্য করতে পারলো না—তারা খুলে দিল তাদের বুক খালি করে' বুক-ভরা জলের থলিগুলো! মুষল-ধারে বৃষ্টি নামলো। আগুন সে বৃষ্টির সঙ্গে যুঝতে পারলো না—ধূম্র-বাষ্পের জমাট কুণ্ডলী সৃষ্টি করে' তারি আড়াল দিয়ে আগুন পলায়নপর হলো! আগুনের পরাজয় দেখে মেঘের দল বজ্রনাদে অট্টহাস্য করতে লাগলো! মেঘেদের চোখে চোখে বিদ্রূপ-অগ্নি ফুটতে লাগলো দিকবিদিক জুড়ে!

সে কি দুর্যোগ, কলকাতা-সহরের বুকে ঘরের মধ্যে বসে তার কল্পনা করতে পারবে না! মরণ নিশ্চিত বুঝে আমরা জড়োসড়ো হয়ে চুপচাপ বসেছিলুম শুধু মরণের আগমন প্রতীক্ষা করে'! প্রতি-ক্ষণে মনে হচ্ছিল, ঐ বুঝি এলো, ঐ বুঝি তার পায়ের ধ্বনি! কি মূর্ত্তিতে সে আসবে—বসে-বসে তারি জল্পনা চলেছিল!···

পৃথিবী, বর্ম্মা, বাংলা দেশ, জাপানী—সব চিন্তা ঝড়ে-জলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুয়ে মুছে একাকার!

ভোরের দিকে ঝড়-জল থামলো···

কার যাদু-মন্ত্রে!—

...ঁায় যখন বামা পড়ে

সাত্যকি বললে—পথে বেরিয়ে একটা বেশ মজা দেখছি। সে মজা, এই ঝড়-জলের লীলাখেলা! দিনের বেলায় কোথায় থাকে ও-সব মেঘ···সন্ধ্যা হতে না হতে আকাশ জুড়ে জটলা করে কি দৌরাত্মই না বাধায়!

নদীর দিকে চেয়ে দেখি, বাঃ, জলও দিব্যি কমে গেছে! আশ্চর্য্য! এত বৃষ্টি···জল কোথায় কূলে কূলে আরো ভরে উঠবে, তা নয়···

আমি বললুম,— জোয়ার-ভাঁটা খেলে, দেখছি!

অনাথ ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ। এখন ভাঁটা!

দেখি, ভাঁটার মুখে জলের বুকে আমাদের লঞ্চের দেহ মরা কচ্ছপের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে!

বললুম—অনেক জিনিষ রেখে এসেছি লঞ্চে···সিগারেটের টিন, কন্‌ডেন্সড্ মিল্কের টিন—সেগুলো অন্ততঃ উদ্ধার করা চাই।

সাত্যকি বললে – মশারিগুলোও রেখে এসেছি। যে মশা দেখা গেছে···হাঁটা-পথে জঙ্গল ভেদ করে যখন গতি, তখন মশারি চাই সব-আগে।

আমি বললুম—কিন্তু কে আনতে যাবে?

প্রভাত বললে—সঙ্গী পেলে আমি রাজী!

বন্যা : যখন বোম পড়ে

এ-কথা বলে প্রভাত চাইলো আমার পানে। বললে—যাবে বীরু?

সর্ব্ব কার্য্যে চিরদিন আমি অগ্রণী হই…এখন কিন্তু জলে নামতে ইচ্ছা হলো না। মনে হলো, এই আমাদের জননী ধরিত্রীর মাটির কোল…নিরাপদ আশ্রয়! একে ছেড়ে কে যাবে জলে?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়লো,—

'খল জল ছল-ভরা তুলি লক্ষ ফণা'

… …

আর জলের কোলে মাটীর এই তীর! আহা! আবেগ-ভরে কবি সাধে বলেছেন—হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌন-মূক, অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব…সর্ব্ব-উপদ্রসহা আনন্দ-ভবন…শ্যামলা কোমলা…

তবু যেতে হলো। লঞ্চ চাই। এখন দিনের আলোয় মশার দেখা নেই—কিন্তু রাত্রে সেই লক্ষ লক্ষ মশা… আমাদের লক্ষ্য করে তাদের সেই অজস্র দশন-শর-সন্ধান চলবে!

জলে নামলুম। লঞ্চে উঠে বসলুম। লঞ্চের যে অবস্থা, তাতে বুঝলুম, তার অন্তিম-শ্বাস বহির্গত…নাড়া দিলেও সে আর নড়বে না!
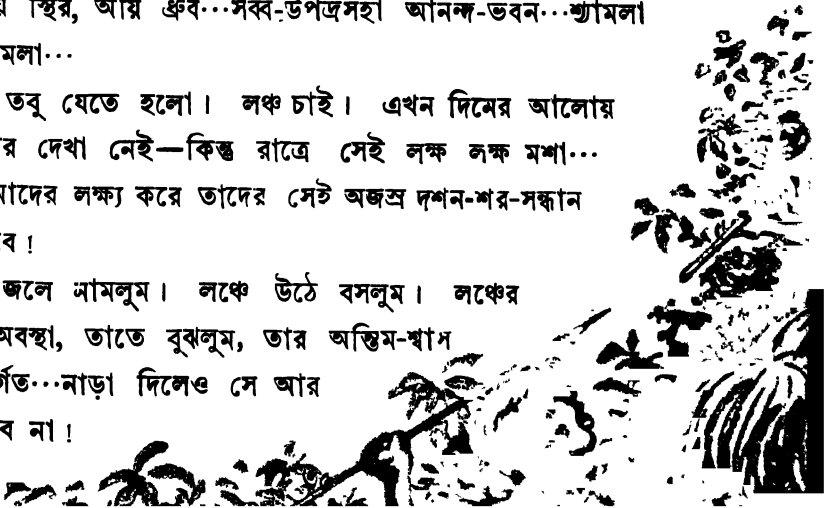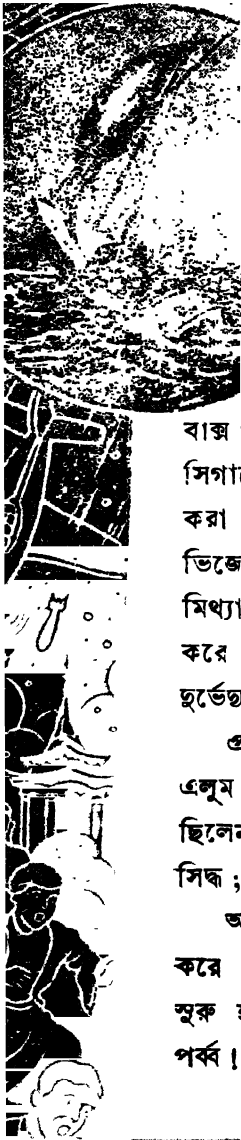
বাক্সটা লণ্ড-ভণ্ড হয় নি; খোলে পড়ে আছে। বাক্সটা ধরে ভেসে তীরে ফেরা সম্ভব হবে না!

প্রভাত বললে—কাঠগুলো ভেঙ্গে-চুরে সঙ্গে নিই। দাঁড়গুলো আপৎকালে অস্ত্রের কাজ করবে।

ভাঙ্গচুর করে কাঠ খুলে নিলুম। কাঠের বাক্স খুলে বার করলুম দুধের টিন, মাছ আর ফলের টিন এবং সিগারেটের টিনগুলো। ছুরি-কাঁটা ছিল—সেগুলো ত্যাগ করা সমীচীন নয়—সেগুলোও নিলুম। বিছানার মোটটা ভিজে ঢিপসি ভারী হয়ে আছে! বালিস নিলুম না। মিথ্যা ভার বাড়ানো! পথ চলা দুঃসহ হবে! মশারি বার করে নিলুম···মশার হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ!

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে ভেসে আবার তীরে ফিরে এলুম। অনাথ ডাক্তার ষ্টোভ্ নিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে ছিলেন। খিচুড়ি রান্না হলো। আর হলো আলু সিদ্ধ, ডিম সিদ্ধ; শেষে টিনের দুধ ঢেলে ক্ষীর-পায়সান্ন।

আহারাদির পর মালপত্র বেঁধে ভাগাভাগি করে ক'জনে সে-ভার শিরোধার্য্য করলুম এবং তারপর সুরু হলো হাইকারদের মতো স্থল-পথে আমাদের যাত্রা-পর্ব্ব! কারণ, বিজনে নদীর তীরে বসে থাকলে মৃত্যু

এসে দেখা দেবে অনিবার্য্যভাবে। এ-নদীতে কোনো কালে কোনো নৌকো আসবে না! মাথার উপর আকাশে কোনোদিন ব্রিটিশ-প্লেন এসে যে এ-বিজন-বাস থেকে উদ্ধার করবে, সে আশাও সুদূর-পরাহত। আমার মনে পড়ছিল মহাভারতের কথা…দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা! আমাদেরও এ-যাত্রা ঠিক তেমনি —জন্মভূমির স্বর্গ-দ্বারে পৌঁছুবো, না, মৃত্যুলোকে…বিধাতা ছাড়া সে-কথা কেউ বলতে পারে না! মনের ভাব ছিল তখন আশ্চর্য্য রকমের! মন থেকে পৃথিবী যেন মুছে গিয়েছিল!
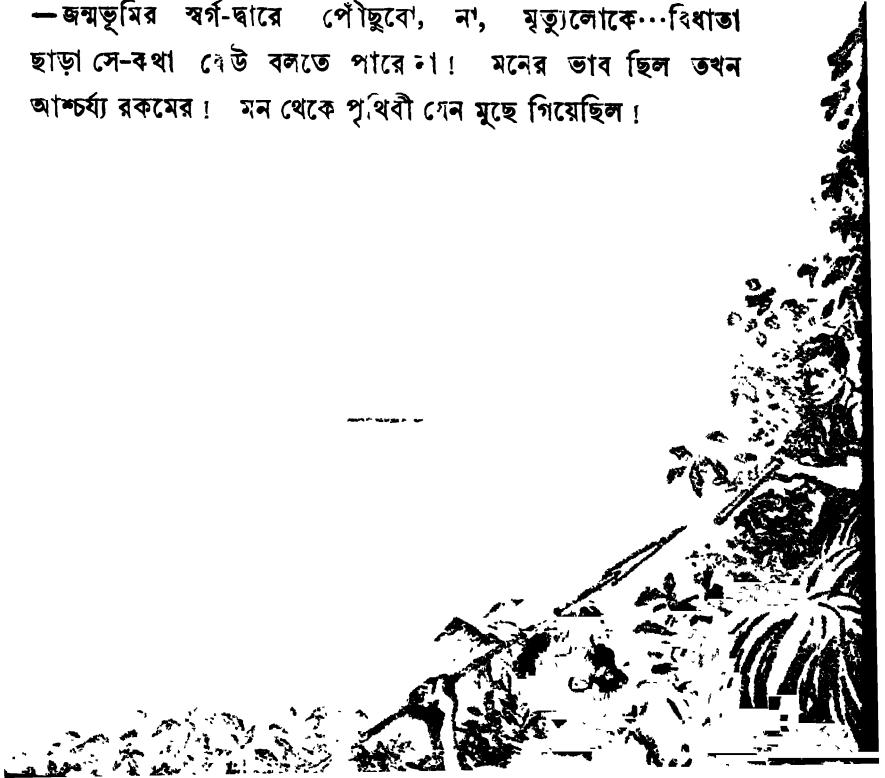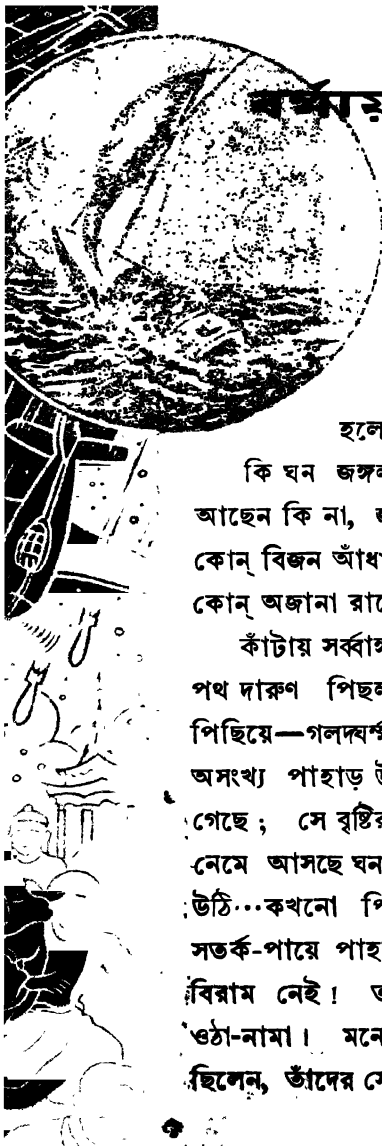
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জঙ্গল ভেদ করে আমাদের পথ। সঙ্গে ছিল বর্ম্মা-ভারতের ম্যাপ। সেই ম্যাপ দেখে দিক-বিদিকের হিসাব কষে' একটা দিক ধরে আমাদের পাড়ি স্বরু হলো!

কি ঘন জঙ্গল! মাথার উপর আকাশে দিনের সূর্য্য বসে আছেন কি না, জঙ্গলে তার কোন পরিচয় মিললো না। যেন কোন্ বিজন আঁধার-রজনীর পথে চলেছি—প্রাণহীন, প্রাণিহীন কোন্ অজানা রাজ্যের দিকে!

কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়ে যাচ্ছিল! মাঝে মাঝে বৃষ্টির জলে পথ দারুণ পিছল। সে-পিছলে দু'পা এগুতে পাঁচ পা যাই পিছিয়ে—গলদঘর্ম্ম ব্যাপার! তাও কি প্লেন্ জমি···ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় উঠেছে দিকে-দিকে। রাত্রে ভীষণ বৃষ্টি হয়ে গেছে; সে বৃষ্টির জল-ধারা বিপুল স্রোতে পাহাড়ের গা বয়ে নেমে আসছে ঘন-গর্জ্জনে! কখনো সে-স্রোত ঠেলে পাহাড়ে উঠি···কখনো পিছলে পড়ে পাছে মাথা ফাটে, ভয়ে-ভয়ে সতর্ক-পায়ে পাহাড় থেকে নীচে নামি! এ ওঠা-নামার আর বিরাম নেই! তার উপর জঙ্গল ঠেলে গাছপালা ঠেঙ্গিয়ে ওঠা-নামা। মনে হচ্ছিল, পঞ্চপাণ্ডব যে মহাপ্রস্থান করে-ছিলেন, তাঁদের সে পথও ছিল বুঝি এমনি! এবং এমনি দুর্গম

বর্ষায় যখন বামা পড়ে

পথে চলার জন্যই দ্রৌপদী এবং ভীম-অর্জ্জুন, নকুল-সহদেবের হয়েছিল একে-একে পতন ও মৃত্যু। মনে হচ্ছিল, আমরা সংখ্যায় পাঁচজন নই, চারজন, সঙ্গে দ্রৌপদী নেই! তবু এই চারজনের মধ্যে কোন্ তিন-জন ভীম-অর্জ্জুনের মতো মহাপ্রস্থানের পথে দেহ রক্ষা করবে, আর কে-বা যুধিষ্ঠির হয়ে মৃত্যুর ফাঁদ কাটিয়ে স্বর্গ-দ্বারে উপনীত হবে, সেইটেই শুধু এ-নাটকের শেষ অঙ্কে দেখবার বস্তু!

চলেছিলুম অত্যন্ত ধীর পায়ে। জোরে যাবার উপায় ছিল না এবং চলায় বিরাম দেবো না, এই ছিল আমাদের পণ।

দিনের সূর্য্য মধ্য-গগন ছেড়ে পশ্চিম-গগনের দিকে হেললেন। আমাদের দেহ-মন ছম্‌ছম্ করতে লাগলো! আবার আসছে সেই রাত্রি! ঐ রাত্রির সঙ্গে আবার সুরু হবে হয়তো প্রকৃতির উদ্দাম তাণ্ডব—ঝড়-জলের বিরাট মত্ততা! সে-বিপত্তি ঘটলে এ-জায়গায় কি করে আত্মরক্ষা করবো, ভেবে কূল-কিনারা মিলছিল না!

কিন্তু রাত্রে ঝড় এলো না, বৃষ্টি জমে রইলো আকাশের ও-পারে!...চাঁদ এসে বসলো আকাশের আসনে· মশার দল ব্যাণ্ড বাজিয়ে আবার পৃথিবী-বিজয়ে বেরিয়ে এলো!...

মনে হচ্ছিল, এরা মশা নয়...জাপ... মশার মূর্ত্তি [illegible]
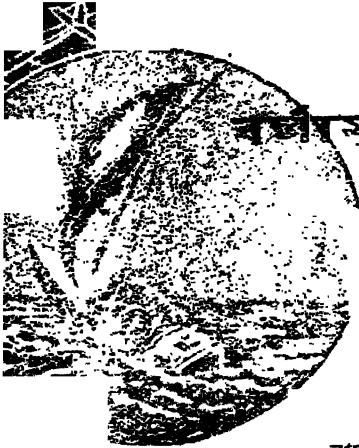
বর্মায় যখন বোমা পড়ে

গাছের ডালে মশারির কোণ বেঁধে আমরা তৈরি করলুম ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পের মধ্যে বসে রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা হলো। কাঠ-কুটো জড়ো করে কাছাকাছি অগ্নিব্যূহ রচনা করে নিলুম··· এ-ব্যূহ ভেদ করে শুধু মশা কেন, বনে যদি বাঘ-ভালুক থাকে, সাপ-বিছা থাকে, তারাও চট্ করে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না!

রাত্রিটা মন্দ কাটলো না! পরের দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আহারাদি সেরে আবার সুরু যাত্রা-পর্ব্ব।

দুদিন, দু' রাত্রি···তিন দিন, তিন রাত্রি কাটলো শুধু হেঁটে আর হেঁটে। ঝড়-বৃষ্টির উৎপাত ঘটলো না। বুঝি, আশ্রয়হীন লক্ষ্যহীন আমাদের দুঃখে বিধাতার মনে করুণার সঞ্চার হয়েছিল!

এ-ক'দিন জনপ্রাণীর চিহ্ন চোখে দেখিনি! এমন বনের কল্পনাও কখনো করিনি!

চতুর্থ দিন · বেলা তখন প্রায় বারোটা, জনাথ ডাক্তার বললেন—লোকালয়ের গন্ধ পাচ্ছি যেন!

আমরা অবাক! বললুম,—মানুষের গন্ধ?

—তাই।

প্রভাত বললে—রাক্ষসের গল্পে শুনেছি, রাক্ষসরাই শুধু এ-গন্ধ টের পায়। সেই হাঁউ-মাউ-খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ!... আপনিও...?

হেসে অনাথ ডাক্তার বললেন—আর যাই হই, রাক্ষস আমি নই নিশ্চয়।

আমি বললুম,—না, না, ঠাট্টা নয়। লোকালয়ের গন্ধ পাচ্ছেন কি-রকম, খুলে বলুন ডাক্তারবাবু।

অনাথ ডাক্তার বললেন—লোকালয়ের বা মানুষের গন্ধ সত্যি পাওয়া যায়, বীরুবাবু। সে-গন্ধ আমি পাচ্ছি। কিন্তু এ-গন্ধ সভ্য-মানুষের নয়, এখানকার বর্ম্মীজদের গন্ধ।

সাত্যকি বললে—তারা দুশমনী করবে নিশ্চয়?

অনাথ ডাক্তার বললেন,—বলা যায় না। তবে আমাদের এখন যে-অবস্থা চলেছে, এ-অবস্থায় শত্রু হোক, মিত্র হোক, মানুষের দেখা পেলে তার সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াতে হবে যাকে বলে gambling...ভাগ্য নিয়ে আমাদের এখন gamble করবার সময়।

বললুম,—এ-লোকালয় কত দূরে?

অনাথ ডাক্তার দু' সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়ালেন যেন ধ্যানীর মতো! তারপর বললেন—তা দু'এক ঘণ্টার পথ হবে।

আমাদের মনে উৎসাহ জাগলো... পা-গুলো ব্যথায় টনটন্ করছে—

যখন বোমা পড়ে

দেহ এমন হয়েছে যে পথে লুটিয়ে পড়তে পারলে যেন বেঁচে যাই···মাথার মধ্যেও কেমন ঝিমিঝিমি ভাব! মনে হচ্ছিল, যেন তন্দ্রার ঘোরে চলেছি · দম-খাওয়া পুতুল যেন!

অনাথ ডাক্তারের কথায় শিরায় শিরায় তপ্ত তরল রক্তের প্রবাহ বইলো নূতন তেজে··· নূতন শক্তিতে! আমাদের গতিতে বেগ বাড়লো। পথ ক্রমে সমতল হয়ে আসতে লাগলো, জঙ্গলের ঘনতা ঘুচে কাঁটা-ঝোপ প্রভৃতি বিরল হতে লাগলো!

অনাথ ডাক্তারের সেই কথা,—দু' তিন ঘণ্টা! থেকে থেকে ঘড়ি দেখছিলুম! দশ মিনিট—পনেরো মিনিট—আধ ঘণ্টা— এমনি করে ঘড়ির দিকে সমস্ত মনটুকু সমর্পণ করার ফলে পথ-শ্রম যেন উপলব্ধির মধ্যে ছিল না! এবং হেঁটে হেঁটে ক্রমে ঘড়ির নির্দ্দেশ-মতো তিন ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হলো!

হঠাৎ প্রভাত বলে উঠলো—মানুষ!

তার স্বরে আমরা চমকে উঠলুম। এ দু-তিন ঘণ্টা যে চলেছি, কারো মুখে কথা ছিল না—সকলের দৃষ্টি শুধু সামনে প্রসারিত।

প্রভাতের কথার উত্তরে আমরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলুম—কৈ?

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

—ঐ যে……বলে প্রভাত সামনে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দেখালো।

নির্দ্দেশ-মতো চেয়ে দেখি, মানুষই বটে! ছোট একটা বাঁশ-ঝাড়…তারি ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা ডোবা; সেই ডোবার জলে গা ডুবিয়ে পড়ে আছে নিশ্চল পাথরের মতো… মানুষ! পোড়া-মাটির মতো গায়ের রঙ—মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা। মেয়ে-মানুষ। বয়স বেশী নয়…পনেরো-ষোল বছর হবে।

অনাথ ডাক্তার বললেন—হুঁ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, জাতে—শান।

আমি বললুম—শান! তার মানে, যারা ডাকাতি করে বেড়ায়?

অনাথ ডাক্তার বললেন—বর্ম্মীজদের মধ্যে এরা সব চেয়ে অমানুষ। এদের মন বলে কোনো পদার্থ নেই। বাঘ-সাপ-কুমীরের মতো হিংস্র আর লোভীর একশেষ।

সাত্যকি বললো আর্ত্তকণ্ঠে,—বলেন কি ডাক্তারবাবু! তাহলে ওদিকে আর কেন? চলুন, আমরা অন্য পথ ধরি।

অনাথ ডাক্তার বললেন—যদি আমাদের দেখে থাকে—তারপর আবার দেখে, আমরা সরে যাচ্ছি, বুঝবে, ভয় পেয়েছি। এবং একবার যদি এরা বোঝে আমরা ভয় পেয়েছি, তাহলে বুকের পাটা বেড়ে যাবে এবং
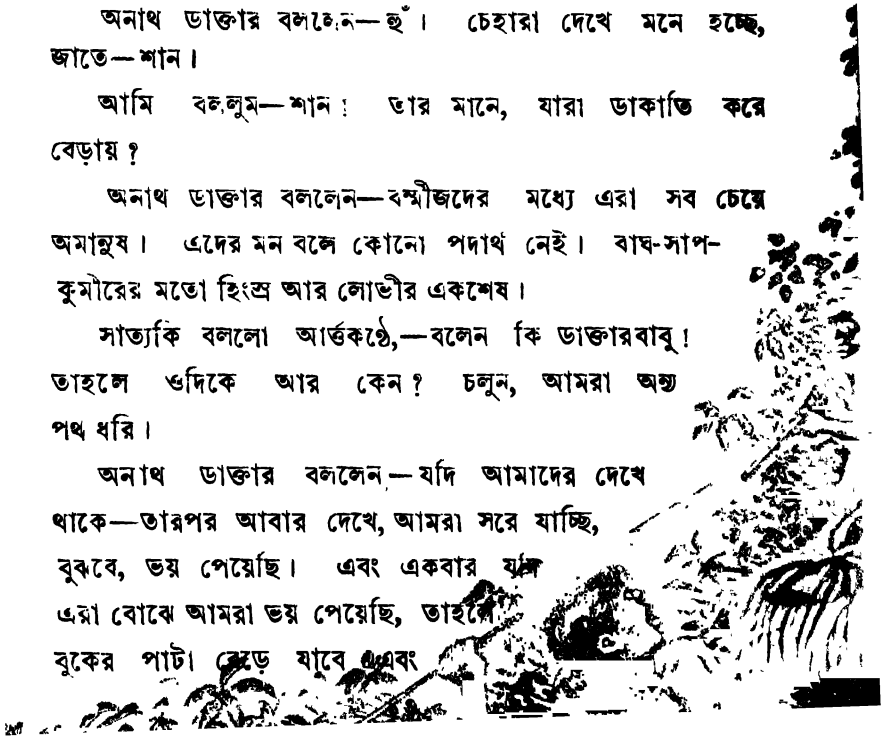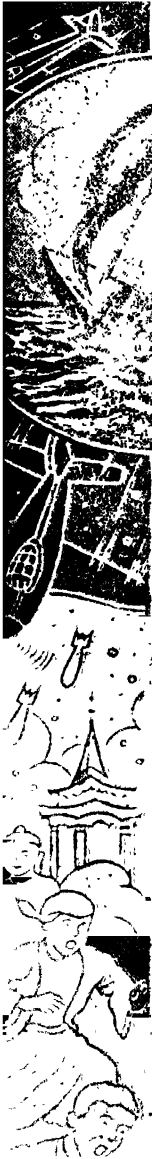
আমাদের আক্রমণ করতে এক-তিল দেরী বা দ্বিধা করবে না।

আমি বললুম—আমরা তাহলে এখন কি করবো ?

অনাথ ডাক্তার বললেন—সোজা গিয়ে সামনে দাঁড়াবো। তাছাড়া আমি প্রায় দশ-বারো বছর বর্ম্মা-মুলুকে আছি, ওদের রীত, স্বভাব, ওদের ভাষা বা মেজাজ কিছু জানি না, ভাবেন ? ভয় করবেন না। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে—আমি সকলের আগে আগে যাবো, আপনারা আসুন আমার পিছনে।

প্রভাত বললে—রাইফেল সম্বন্ধে ব্যবস্থা ?

সাত্যকি বললে—তৈরি রাখা ভালো। যদি তেমন-তেমন দেখি, ছুটোকে মেরে অন্ততঃ মরবো।

অনাথ ডাক্তার বললেন—তেমন তৈরি থাকবার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, কার্টরিজ ভরে রাখুন···সাবধানের বিনাশ নেই।

আমরা ডোবার কাছে পৌঁছুবার আগেই দেখি মেয়েটা জল থেকে উঠে নিঃশব্দে চলে গেল। কোথায় গেল বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে, দেখতে পেলুম না। মনে হলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

আমাদের সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ !

বর্মায় যখন বোমা পড়ে

ডোবার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলুম। খানিকটা খোলা জায়গা। সে-জায়গায় ক'টা খুঁটি পোঁতা আর খুঁটিগুলোর উপর ভর করে রাশীকৃত শুকনো খড়ের ছাউনি। পাশাপাশি এমনি দশ-বারোটা ছাউনি···কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই!

আমরা অবাক্। চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলুম। ভূতের দেশ নয় সত্যি ··একটা মেয়েকে সদ্য দেখেছি···সে ভূত নয়। এবং মানুষ উবে যেতে পারে না। তবে?

সাত্যকি বললে—আমাদের দেখে মেয়েটা হয়তো লুকিয়েছে।

প্রভাত বললে,—দলে খপর দিতে গেছে—তাও হতে পারে।

অনাথ ডাক্তার বললেন—বিচিত্র নয়।

আমি বললুম—গলা ছেড়ে আওয়াজ তুলে একবার ডাকি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে আমি সাড়া জাগালুম, —কোই হ্যায়? হেই···

সাড়া জাগিয়ে দু'মিনিট উৎকর্ণ হয়ে রইলুম—যদি উত্তর মেলে! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! উত্তর নেই। তবে শুনতে পেলুম ছোট ছেলের কান্নার শব্দ···ঐ যেসব ছাউনি, তারি একটার মধ্যে থেকে।

প্রভাত বললে—ওয়াচ্ করছে, আর এগোয় না। সামনে এই একটা গাছের গুঁড়ি দেখছি··· ঐ গুঁড়ির উপর একটু বসি। বসে দেখা যাক কি ঘটে।
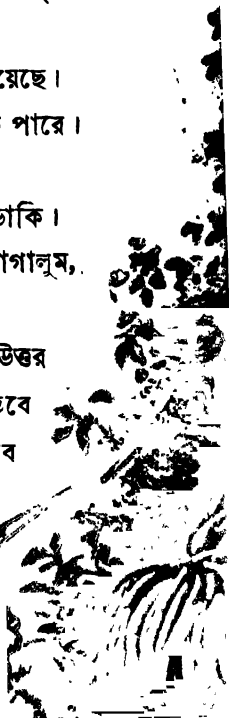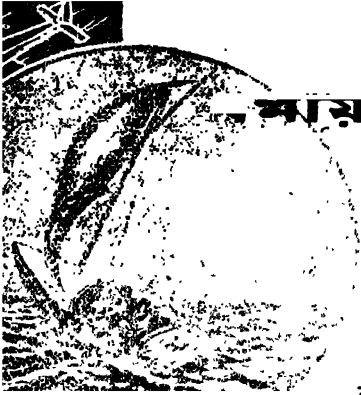
আয় যখন বামা পড়ে

সাত্যকি বললে—মোদ্দা অস্ত্রগুলিকে উদ্যত রাখো!

আমি বললুম—নিশ্চয়!

নিস্তব্ধ ছাউনিগুলোর সামনে···একটু দূরে সেই গাছের গুঁড়ির উপর আমরা বসলুম।

কোনোদিকে এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। কি দারুণ নিঃশব্দতা! সে-নিঃশব্দতায় বুক আপনা থেকে কেঁপে ওঠে। সে-নিঃশব্দতায় মনে হয়, যেন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে তাই চারিদিক যেন দারুণ বিভীষিকা-বশে কাঁটা হ য়ে আছে!

প্রায় পনেরো মিনিট আমরা চুপচাপ বসে রইলুম। কি বিরাট ঘটনা ঘটবে প্রতি-মুহূর্ত্তে তারি প্রত্যাশায়!

কিন্তু কোথায় কি!

আমার ধৈর্য্য টললো। অনাথ ডাক্তারের পানে চেয়ে বললুম—এমনি করে আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে বল্মীক-স্তূপে পরিণত হবো মশাই।

অনাথ ডাক্তার বললেন—এসব বুনো-জাতকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধারের প্রধান মন্ত্র হলো ধৈর্য্য···অচল অটল ধৈর্য্য। মাথা ঠাণ্ডা এবং ধৈর্য্য রাখতে না পারলে একটু ভুলচুকে এরা যা-তা কাণ্ড করে ফেলতে পারে।

কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে তো! সে-সীমা রক্ষা করা ক্রমে দায় হলো। আঙুলে নখ হয়েছিল বড় বড়···বাবা

তারকনাথের মানতের নখের মতো। সেই নখ দিয়ে সামনের
মাটিতে আমি দশ-পঁচিশ খেলার ছকের নক্সা আঁকতে লাগলুম।
সাত্যকি উর্দ্ধে আকাশের পানে চেয়ে রইলো। বুঝি, ঐ আকাশের
ওপারে স্বর্গ আছে কিনা, তাই লক্ষ্য করছিল!

হঠাৎ একটা শব্দ! ডাল-পালা ভাঙ্গার শব্দ। সে শব্দ লক্ষ্য
করে চেয়ে দেখি, জঙ্গলের গায়ে খানিকটা দূরে দুজন মানুষ···
কৌপীন-ধারী! তাদের পিছনে বারো-তেরো বছর বয়সের সেই
মেয়েটি। তিনজনে আমাদের দিকে আসছে।

প্রভাত বললে—সেই মেয়েটা! পরণের কাপড় ভিজে
মনে হচ্ছে।

ওদের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে ওদের গতিবিধি আর ভঙ্গী
লক্ষ্য করতে লাগলুম।

ওরা আমাদের দেখেছে। ওদের মধ্যে সকলের আগে যে,
সে-লোকটির বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ বছর। পরণে কৌপীন···
বেঁটে মোটা চেহারা—হাতে তীর আর ধনুক। তার পিছনে
যে পুরুষ, তার বয়স বাইশ-চব্বিশ। তার হাতে মোটা
একটা সড়কী! আর এদের দুজনের পিছনে সেই মেয়েটি
নিরস্ত্র! মেয়েটির দু'চোখের দৃষ্টিতে অসহ্য কৌতূহল।

সব-আগে যে-লোক, সে তার ধনুক তুলে
তাগ করলো—দেখে প্রভাত তার রাইফেল
উঁচিয়ে ধরলো ওদের লক্ষ্য করে।

অনাথ ডাক্তার বললেন,- খবরদার।
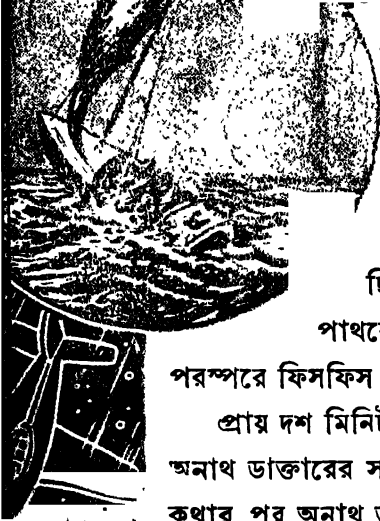
বললেই প্রভাতের বন্দুকটা নামিয়ে ধরে ওদেশের বিচিত্র ভাষায় ওদের লক্ষ্য করে কি বললেন।

কি বললেন, তার বিন্দুবাষ্প আমরা বুঝলুম না; তবে তাঁর কথায় যেন মন্ত্র ছিল! সে কথা শুনে ওরা তিনজনে পাথরের পুতুলের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়লো। পরস্পরে ফিসফিস শব্দে কি বলাবলি করতে লাগলো।

প্রায় দশ মিনিট ধরে ওদের এই ফিসফিস-গুঞ্জন চললো! অনাথ ডাক্তারের সঙ্গেও তাদের কি-সব কথাবার্ত্তা হলো। সে কথার পর অনাথ ডাক্তার আমাদের পানে তাকিয়ে বললেন—

না, ওরা জাতে শান্ নয়—ওরা অন্য জাত। কি জাত তা বল্‌বে না। আমি ওদের বললুম, আমরা ভারতবর্ষে যাচ্ছিলুম, জলে আমাদের বোট ডুবে গেছে, তাই হাঁটা পথে চলেছি। যেতে যেতে পথ ভুলে বনে এসে ঢুকেছি। তাতে ওরা বলছে, এ-অঞ্চলে আমাদের মতো মানুষ এর আগে কখনো আসেনি। আমাদের ওরা আশ্রয় দেবে, বলছে। বলছে, কোনো ভয় নেই।…

এসব কথাবার্ত্তার মধ্যে মেয়েটি ছুটে গিয়ে ঢুকলো এক ছাউনির মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চেতন ছাউনিগুলো চেতনা পেয়ে জেগে উঠলো এবং চকিতে ছাউনিগুলোর মধ্য থেকে দলে দলে

বহু লোক :বেরিয়ে এলো। নানা বয়সের লোক···মেয়ে আর পুরুষ। চোখে তাদের কী কৌতূহল! ক'জনের চোখে দেখলুম বিরাগ···দৃষ্টি হিংসায় জ্বল-জ্বল করছে!

রক্ষা পাওয়া গেল সেই ডোবায়-দেখা মেয়েটির কল্যাণে। পাড়ায় পাড়ায় খবর জানিয়ে সে ফিরে এলো। এবং এসে একেবারে অনাথ ডাক্তারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। তাঁর হাতের বন্দুকটায় হাত বুলিয়ে গর্ব্বভরে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলো! তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন সকলকে বলতে চায়—এদের দেখে তোমরা এত ভয় পাচ্ছো, আর আমাকে ছাখো, আমি এসে এদের সঙ্গে কেমন ভাব করেছি!

প্রভাতের মনে জাগলো খেয়াল! কাঁধের ঝোলা থেকে বিস্কুটের একটা প্যাকেট বার করে মেয়েটির হাতে দিলে। এদেশী ভাষায় মেয়েটাকে কি-সব বললেন অনাথ ডাক্তার! ডাক্তারের কথা শুনে মেয়েটা সস্মিত হয়ে প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট মুখে দিল!

তারপর আতিথ্য-গ্রহণের কাজ সহজ হয়ে উঠলো আমাদের জন্য একটা ছাউনি ওরা ছেড়ে দিল। কিন্তু অনাথ ডাক্তার বললেন,—ছাউনির ঘেরাটোপে চেয়ে খোলা জায়গাই ভালো! গতিবিধির ওপর নজর রাখতে কেন না, ওরা অতি [illegible]
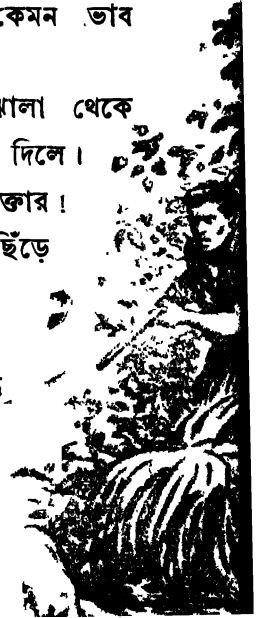
সময় যখন বামা পড়ে

আমাদের কাছে রাজার ঐশ্বর্য্য আছে বলে এদের বিশ্বাস। কাজেই সে-ঐশ্বর্য্য লুঠ করে নেবার জন্য ওদের মন আর হাত শুড়শুড় করবে খুবই। তাহলে ছুদিন এখানে বিশ্রামও নিরাপদ হতে পারবে না। কারণ, আমাদের দেখে ওদের যে চমক, যে ভয় প্রাণে জেগেছে, ছুদিনের মেলামেশায় সে-ভয় যদি একটু ঘোচে, তাহলে আমাদের মারধোর করে লুঠ-তরাজে ওদের কিছুমাত্র বাধবে না!
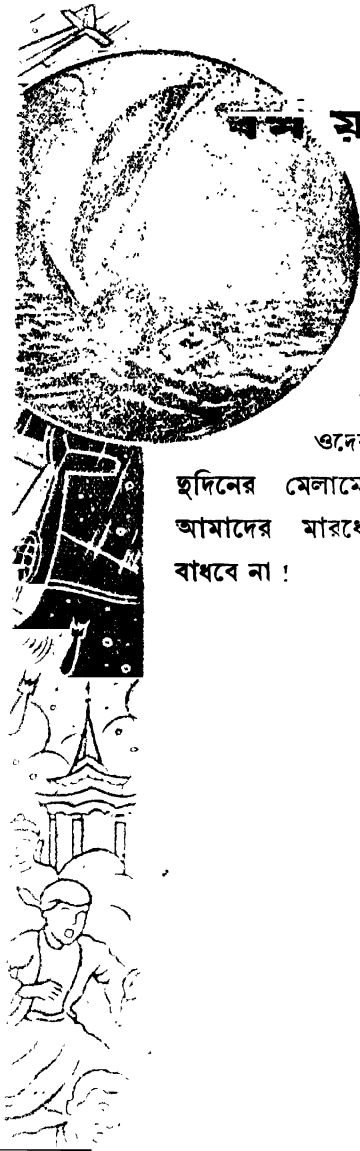
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর অনাথ ডাক্তার চললেন আমাদের হোষ্টের সঙ্গে দেখা করতে। সে-মেয়েটি ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেছে···ডাক্তার তাকে দেছেন টিনের দুধে রুটি ভিজিয়ে সেই রুটি খেতে! সে-অমৃত সেবনে মেয়েটা যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে।

দীর্ঘকাল পরে নিরুপদ্রব জায়গা পেয়ে আমরা তিনজনে শয্যা বিছিয়ে সেই শয্যায় দেহ-ভার লুটিয়ে দিলুম। ক'দিন ঘুমের সঙ্গে পরিচয় ছিল না—আজ নিদ্রাকে না-ডাকতে সে এসে চেপে বসলো আমাদের চোখের পল্লবে!···

বিকেলে ঘুম ভাঙ্গলো। সূর্য্য তখন পশ্চিমে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে নিজের কিরণজাল গুটিয়ে নিয়েছে··· অনাথ ডাক্তার ফিরে এলেন। সঙ্গে সেই মেয়েটি।

অনাথ ডাক্তার বললেন,—সর্দ্দার পথের হদিশ বলে দেছে···এখান থেকে যাবো সোজা পূব-মুখে···একদিনের পর একটা গ্রাম মিলবে, সেই গ্রাম থেকে পাহাড় টোপকে পথ গেছে ভারতবর্ষের দিকে। সেই গ্রামে ভারতের মানুষ মিলতে পারে। বললে, এ-পথে কেউ ভারতবর্ষে যায় না। এদিককার পথ খুব খারাপ। প্রায় দুর্গম। লোকের বসতি দূরে-দূরে। তাছাড়া নদী
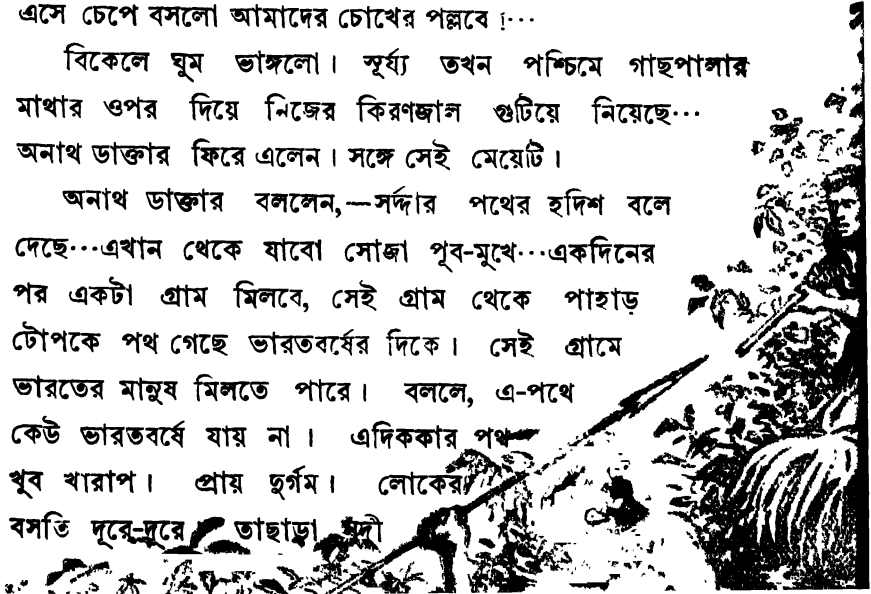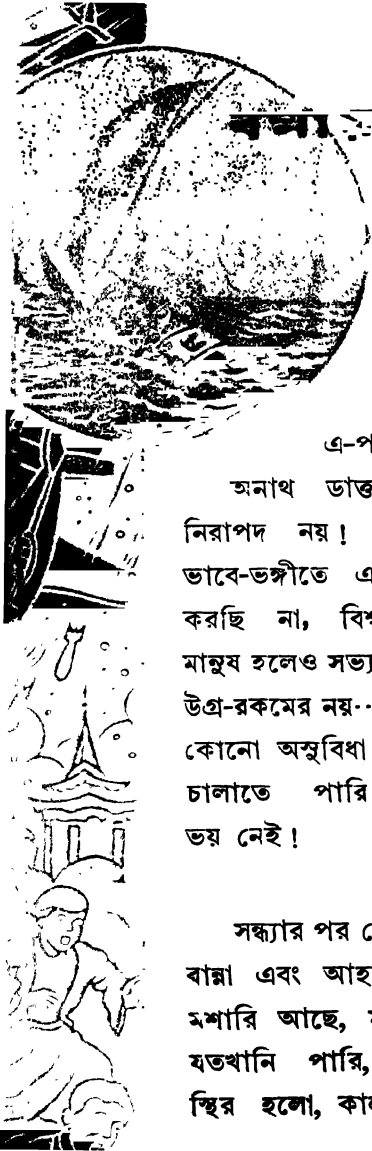
আর বন, পাহাড় আর জলার অন্ত নেই। নদীতে নৌকো নেই, পুল নেই। খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে।

আমি বললুম,—লোকটা যে সত্য কথা বলেছে, তার প্রমাণ ?

সাত্যকি বললে,—ওর কথা শুনে এ-পথে গিয়ে যদি কোনো বিপদে পড়ি ?

অনাথ ডাক্তার বললেন—এ-অঞ্চলের কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়! এখানেই কি আমরা নিরাপদ, ভাবেন ? ভাবে-ভঙ্গীতে এদের বোঝাবো, আমরা যেন এদের ভয় করছি না, বিশ্বাস করছি। বোঝাবো, সভ্য-সমাজের মানুষ হলেও সভ্যতার বুকে ফিরে যেতে আমাদের বাসনা খুব উগ্র-রকমের নয়···এদের দলে থাকতে পেলেও যেন আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এদের সঙ্গে থাকতে strategy চালাতে পারি যদি, তাহলে এদের হাতে কোনো ভয় নেই!

সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নায় বনের বুক ভরে গেল···আমরা রান্না-বান্না এবং আহারের কাজ সেরে নিদ্রা দেবো স্থির করলুম। মশারি আছে, মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবো। অর্থাৎ যতখানি পারি, আজ রাত্রে বিশ্রাম এবং নিদ্রা···কারণ, স্থির হলো, কাল সকালে উঠে আবার যাত্রা সুরু···এবং

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

যাত্রা-পর্ব্বের সে-অঙ্কে বিশ্রাম আর মিলবে কিনা কে জানে! মিললেও কোথায় এবং কবে, তার ঠিক নেই!

মাটির উপরে চ্যাটাই পাতা...শুয়ে গড়াচ্ছি...ধরণীর স্নেহ-স্পর্শ উপলব্ধি করছি সঙ্গে সঙ্গে...এমন সময় দেখি, চলন্ত ছায়া...সরে সরে আমাদের দিকে আসছে! ছায়া কখনো দাঁড়ায়, কখনো নড়ে! বুঝলুম, সেই মেয়েটি! আসছে যেন অত্যন্ত সতর্ক পায়ে...কেউ না ওকে দেখে ফেলে! সকলের চোখের দৃষ্টি বাঁচিয়ে সে আসছে।

অবাক হয়ে উঠে বসলুম।

মেয়েটি এলো...আমাদের সকলের পানে তাকালো... তারপর গেল অনাথ ডাক্তারের কাছে। অনাথ ডাক্তারের কাঁধে হাত দিয়ে কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নানা-রকম ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে কি-সব বললে। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলুম, মেয়েটির কথায় ডাক্তারের দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো!

কথা শেষ করে মেয়েটি চকিতে চলে গেল...যেন বাতাসের একটা দমকা বেগ সরে গেল!

মেয়েটির চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বললেন,— অটোমেটিকটা দাও হে, বিপদ আসন্ন।

বুঝলুম, মেয়েটি এসে সতর্ক করে গেছে। মনে হলো, ওর এত মায়া কেন আমাদের উপর? কল্পনার তুলি ধরে
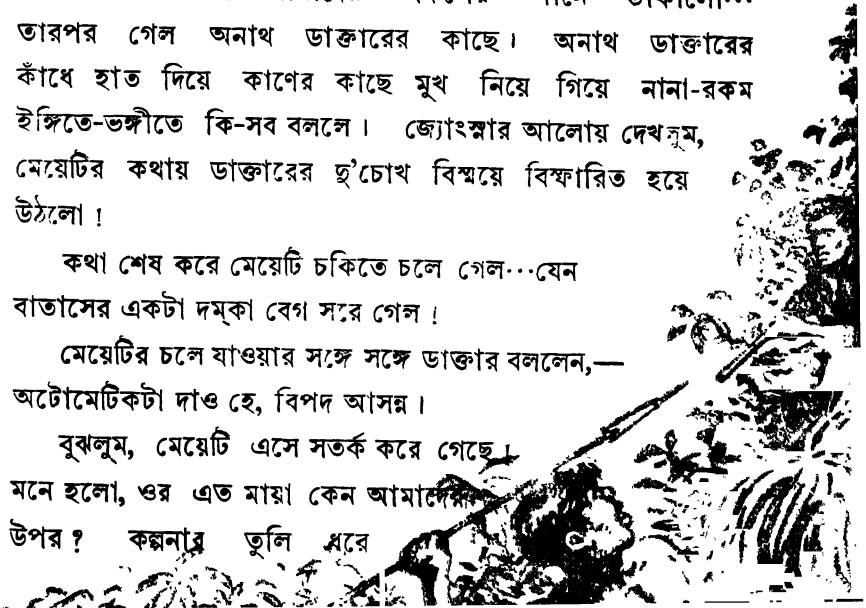
মেয়েটিকে ঘিরে হয়তো ক'জনে অনেক কাহিনী রচনা করতুম······কিন্তু তার অবসর মিললো না। একটু দূরে শুকনো পাতায় মর্ম্মরধ্বনি জাগলো। চেয়ে দেখি, গাছের ছায়ায়-ছায়ায় গা মিশিয়ে কতকগুলো লোক আসছে···বেঁটে মোটা··· মাথায় চুলের ঝুঁটি বাঁধা, হাতে সড়কী আর লাঠি। একগাদা লোক।

আমরা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রইলুম···খুব সতর্ক, খুব সপ্রতিভ! ছুরি ছোরা লাঠি রাইফেল এবং অটোমেটিক! বনে কাজ করি···নানা বেশে মরণ আমাদের ধার ঘেঁষে ঘোরাফেরা করে! কাজেই সরকারী-কাজের স্বার্থে সরকার আমাদের কোনো অস্ত্র-দানে কৃপণতা রাখে নি!···

ঐ আসছে! সতর্ক সন্তর্পিত গতি···ছায়ার মতো কালো কালো মূর্ত্তি! আমার কাছে ছিল টর্চ্চ-ল্যাম্প···তার রশ্মি ফেললুম ঐসব কালো ছায়া লক্ষ্য করে! সে-আলোয় দেখি, ওদের আগে-আগে আসছে সর্দ্দার···যে আমাদের আতিথ্যে এখানে আপ্যায়িত করেছে।

মুখে আলো পড়তে ওরা যেন শিউরে উঠলো! ভয়ে যাকে বলে কেঁপে ওঠা—তাই। অনাথ ডাক্তার কি একটা ভাষা উচ্চারণ করলেন। শুনে ওরা কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো! অনাথ ডাক্তার উঠে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন—

বর্মা : যখন বোমা পড়ে

ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে মনোভাবের কি আদান-প্রদান হলো, জানি না! ওরা নিঃশব্দে চলে গেল।

অনাথ ডাক্তার ফিরে এলেন আমাদের কাছে···বললেন— ওরা ভড়কে গেছে! বুঝেছে, শক্ত পাল্লা! আজ আর ফিরবে বলে মনে হয় না! তোমরা কিন্তু এখনি তৈরি হয়ে বসে থাকো মশারির মধ্যে। বাইরে স্যাণ্ড-ফ্লাইয়ের ঝাঁক দেখা দেছে! দুটো মশাল জ্বেলে দিই। তারপর দেখি, সে মেয়েটি কোথায় গেল!

আমি বললুম—ও আমাদের বন্ধু! কিন্তু আশ্চর্য্য, ওদের ঘরের মেয়ে···আমাদের চেনে না, জানে না—অথচ ওদের হাত থেকে আমাদের সতর্ক করছে!

প্রভাত বললে—মরুভূমির বুকে যিনি ওয়েসিস সৃষ্টি করেছেন, পাথর-পাহাড়ের বুকে তিনিই স্নিগ্ধ জলের নির্ঝরিণী তৈরি করে রাখেন!···

সাত্যকি বললে,—কবি শেলী লিখে গেছেন···

Many a green isle there need be
In this deep wide sea of misery...

চিন্তাশীলতার এত বড় সুযোগ আমিও ত্যাগ করতে পারলুম না···বললুম,—এ-পর্য্যন্ত ক'টা ফাঁড়া কেটে যে রক্ষা পাচ্ছি, তোমরা ভাবো, এর অন্তরালে বিধাতার ইঙ্গিত নেই?

বর্ষায় যখন বাসা পড়ে

মশাল জ্বালা হলো···আমরা ঢুকলুম মশারির মধ্যে···অনাথ ডাক্তার চলে গেলেন সেই মেয়েটির সন্ধানে।

এসে বললেন—আজ রাত্রে আর কিছু করবে না! তবে মেয়েটি বলে দিলে, এরা আমাদের জন্য খাবার আনবে ব্যবস্থা করেছে···সে-খাবার যেন কেউ না মুখে দি। আরো বললে, কাল যেন আমরা এখান থেকে নিশ্চয়-নিশ্চয় বিদায় নিয়ে যাই। যে জায়গার কথা সর্দ্দার বলেছে, সে জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য সর্দ্দারকে বলতে বলেছে, সর্দ্দার যেন দুজন লোক দেয় সঙ্গে···তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি বললুম—গায়ে মশারি জড়িয়ে এখনি আমি এ-জায়গা ত্যাগ করতে রাজী আছি।

অনাথ ডাক্তার বললেন—না, না, রাত্রে নয়, কাল সকালে চা খেয়ে সরে পড়বো। পথ এখানে প্লেন-জমির উপর দিয়ে ···কাজেই জোর-পায়ে চলা যাবে।

আমি বললুম—মেয়েটি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু নামটা জানা হলো না তো!

অনাথ ডাক্তার বললেন,—ওর নাম মাণকি। আমি নাম জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

প্রভাত বললে—আমাদের সাহায্য করছে,—ওরা তা বুঝবে না? বুঝে যদি ওর উপর পীড়ন করে?

সাত্যকি বললে—মেয়েটিকে সে-সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেছেন?

অনাথ ডাক্তার বললেন,—যখন বিদায় নেবো, তখন জিজ্ঞাসা করবো।···

সে-রাত্রের মতো কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

মাণকির কথামত খাবার এলো···আমরা সে-খাবার নিলুম। অনাথ ডাক্তার তাদের বুঝিয়ে দিলেন, একটু বেশী রাত্রে আমরা খাবো—খাবার রইলো। তোমরা যে আমাদের এতখানি আদর-যত্ন করছো, এর জন্য বহুৎ বহুৎ সেলাম।

সুদীর্ঘ রাত্রি। আমরা পালা করে পাহারা দিতে লাগলুম দুজন করে···সে পাহারাদারীর অন্তরালে আর দুজন নিদ্রা দেবে। একসঙ্গে সকলের নিদ্রা নিরাপদ হবে না।

পরের দিন সকালে বিদায় নেবার পালা। জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করে সে ভার-বহনের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললুম। সর্দ্দারকে বলবামাত্র দুজন লোক পাওয়া গেল···জোয়ান লোক। তাদের ঘাড়ে লগেজ চাপিয়ে দিলুম···সকলকে সিগারেট বিতরণ করলুম···কি করে সিগারেট [illegible]

করতে হয়, তাও দিলুম শিখিয়ে···তারা মহা-খুশী।

পথ পেলুম। দুধারে বাঁশ-ঝাড়··· বাঁশ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে এক-এক জায়গায় বাঁশের কাঁটায় পথ একেবারে কণ্টকিত! লাঠির ঘায়ে কাঁটার ঝাড় সাবাড় করতে করতে এগিয়ে চললুম।

বিকেলে এলুম ছোট একটা নদীর ধারে। নদীর ওপারে যেন একটু বসতির আভাস! পাড়ে আসতে বিশ-পঁচিশখানা ঘর দেখতে পেলুম। নদীতে কোমর-ভোর জল—গাইডদের পিছুনে আমরাও হেঁটে নদী পার হলুম।

ওপারে দেখি, গ্রামশুদ্ধ লোক এসে দাঁড়িয়েছে। যেন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য তাদের নয়নগোচর হলো, তাদের চোখের দৃষ্টিতে এমন বিস্ময়!

লোকগুলির চেহারা দেখে মনে হলো, মাণকির জাতের লোক এরা! এবং এদের ব্যবহার দেখে মনে হলো, আমাদের পেয়ে খুশী হয়েছে!

আস্তানা পেলুম।

সাত্যকি বললে—ওখানকার সর্দ্দার বলেছে, একদিনের পথে পাবো গ্রাম···আমরা কিন্তু একদিন শেষ হবার আগেই গ্রামের দেখা পেলুম

বর্মায় যখন বাসা পড়ে

প্রভাত বললে—নবশক্তিতে আমাদের চলায় বেগ এখন কত!

মোটঘাট নামিয়ে বসা হলো···আমার কিন্তু নদীর জলে পড়ে আরামে স্নান উপভোগের বাসনা প্রবল হয়ে উঠলো! মনে হচ্ছিল—নদী যেন আমাকে ডাকছে! রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, নদী যেন বলছে ঃ

'যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা
গহন-তলে···
সোহাগ-তরঙ্গ-রাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি'
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি' উরসে গলে!'

এলুম নদীর তীরে। দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর জলরাশির পানে!

হঠাৎ অদূরে একটা শুক্‌নো গাছের গুঁড়ি সচল হয়ে উঠলো! দেখি, গাছের গুঁড়ি নয়—জীবন্ত কুমীর! শিউরে উঠলুম! মনে হলো, কবি বলে গেছেন ঃ

'যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে···'

ও-সলিলে ভাগ্যে গাহন করতে নামিনি···
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির নয়! ও-নীরে
আছে ক্ষুধায় আকুল অধীর কুমীর!
ব্যস রে!
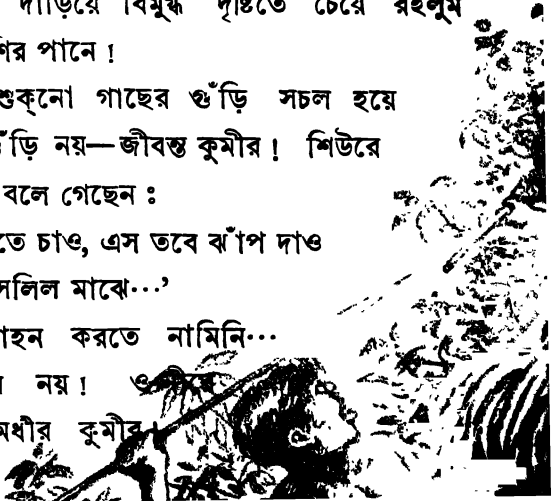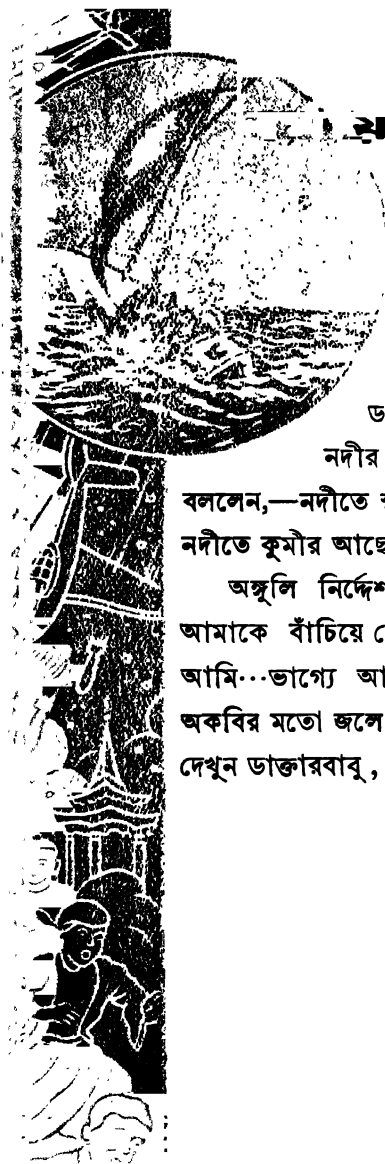
দাঁড়িয়ে কুমীরটাকে দেখতে লাগলুম। সে তার দীর্ঘ দেহ টেনে টেনে অতি ধীর গতিতে জলের দিকে এগিয়ে চলেছে···

আমার গম্ভীর ভাব ভাঙ্গলো অনাথ ডাক্তারের আগমনে। তিনি ছুটতে ছুটতে নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন,—নদীতে স্নান করবেন না কি? খবর্দার! এ-সব নদীতে কুমীর আছে।

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তাঁকে দেখালুম,—ঐ দেখুন! ও আমাকে বাঁচিয়ে দেছে! নদীর শোভা দেখে বাঙালী-মানুষ আমি···ভাগ্যে আমার মনে ভাবোদয় হয়েছিল! না হলে অকবির মতো জলে ঝাঁপ দিলেই যা হতো, মনে করতে এই দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার গায়ে কি-রকম কাঁটা দেছে!

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রামের পিছনে ভীষণ বন। আহারে-বিশ্রামে ক্লান্তি দূর করে বিকেলে গ্রামের সর্দ্দারকে বললুম—আমাদের ঐ বন দেখিয়ে আনবে চলো!

মাথা নেড়ে ভীত-কম্পিত স্বরে সে বললে—না। ও-বনে দানা আছে। ও-বনে যে যায়, সে আর ফেরে না। কখনো কেউ ফিরে আসে নি।

তার সঙ্গে অনেক তর্ক করলুম। দানা যে জীব-জগতে নেই, থাকতে পারে না, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বাদ দিলুম না। কিন্তু সেসব কথা সে কাণে তুললো না। সব কথায় তার শুধু এক জবাব! মাথা নাড়ে আর বলে, না···না···না!

সর্দ্দারের সঙ্গে কথা হলো,—কোন্‌খানে পাবো ভারতবর্ষ?

সর্দ্দার বললে,—বনের গা ঘেঁষে সোজা পথ গেছে দক্ষিণ দিকে···একটা পাহাড়ের আড়াল পার হলে পাবো সমান জমি। পাহাড়ের নাম কুমান। পাহাড়ের ওপারে লামু বলে গ্রাম। সেখানে বহু লোকের বসতি আছে। সাদা-চামড়া বিলাতী আদমী আছে···ভারতবর্ষের কুলি-লোকও আছে। সেখানে আছে সাদা-আদমীদের চা-বাগান···সেখানে গেলে আমরা সহজেই সিধা শড়কের সন্ধান পাবো।
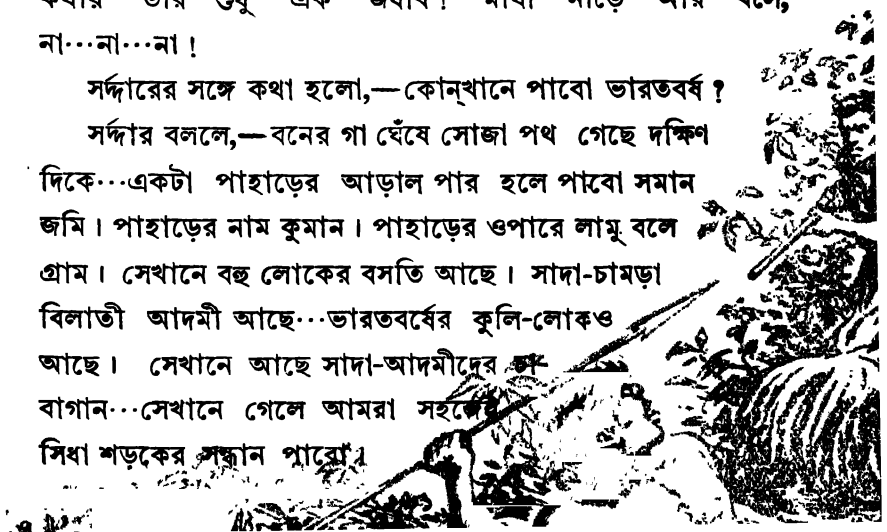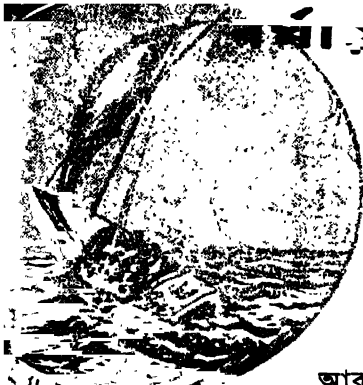
শুনে আমরা স্থির করলুম, আজ আর নয়! রাত্রিকে শিরোধার্য্য করে বন-পথে যাত্রা নিরাপদ হবে না—কাল সকালে যাত্রা করবো···সর্দ্দারের কথামত বনের গা ঘেঁষে বনের ভিতরকার মোহ-মায়া বাঁচিয়ে। বনের উপর মমতার বিপুল আকর্ষণ থাকলেও সে-মমতা দেখাবার সময় এখন নয়!···

গ্রামের লোক শিকার করে দিন কাটায়। সকলের ঘরেই মৃগয়াপটুতার বহু চিহ্ন দেখলুম—বাঘের চামড়া, হরিণের সিং, বন-মহিষের মাথার হাড়!

পরের দিন সকালে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার যাত্রা সুরু হলো। পথে বন আর বন! বনের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানে এখানে বৈচিত্র্যের কী অভাব··· দিনগুলো কাটে নিতান্ত একঘেয়ে রকমে···

ছুপুরে হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। পিছন থেকে কার কণ্ঠে আহ্বানের সঙ্কেত জাগলো! প্রথমে মনে হলো, ভুল! ছ'বার··তিনবার সে-সঙ্কেত জাগলো। পিছনে তাকিয়ে দেখি, কি একটা ছুটে আসছে···

অনাথ ডাক্তার বললেন,—মাণকি!

মাণকি! আমরা একেবারে থ!···দাঁড়ালুম।

বর্ম্মা : যখন বোমা পড়ে

সাত-আট মিনিট পরে ছুটতে ছুটতে মাণকি এসে আমাদের পায়ের কাছে একেবারে তার ক্লান্ত দেহ লুটিয়ে দিলে। দারুণ হাঁপাচ্ছিল সে!

অনাথ ডাক্তার তখনি তার পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করলেন··· আমাদের গতি হলো মন্থর। হিতকারী বন্ধুকে সেবা-শুশ্রূষায় সচেতন সমর্থ করা···সব-চেয়ে বড় কর্ত্তব্য!

সেদিনকার মতো গতি আর দ্রুত অবাধ হলো না। মাণকি বেচারী আমাদের নাগাল পাবার প্রয়াসে আমাদের পিছনে ছুটে এসে তার দেহের সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষ করে দেছে!

মাণকিদের দেওয়া একজন গাইডকে মাণকি পথ থেকে ধরে এনেছে···তাকে সে ছাড়েনি।

পরের দিন মাণকি সচেতন হয়ে পথ-চলার শক্তি অর্জ্জন করলো। এবং যাত্রা সুরু করে বন-পথ ধরে সন্ধ্যার একটু আগে আমরা পেলুম একটা নদী। নদীতে গভীর জল। হেঁটে পার হওয়া যাবেনা, বুঝলুম। সাঁতার কেটে পার হতে সাহস হলো না। যদি কুমীর থাকে!

মাণকি যেন দশভুজা হলো। অনাথডাক্তারকে বলে সে দেখিয়ে দিলে কটা খেজুর গাছ··· খেজুর গাছের কাঁটা ছাড়িয়ে গুঁড়ি কেটে··· নিয়ে একসঙ্গে দু'-তিনটে করে
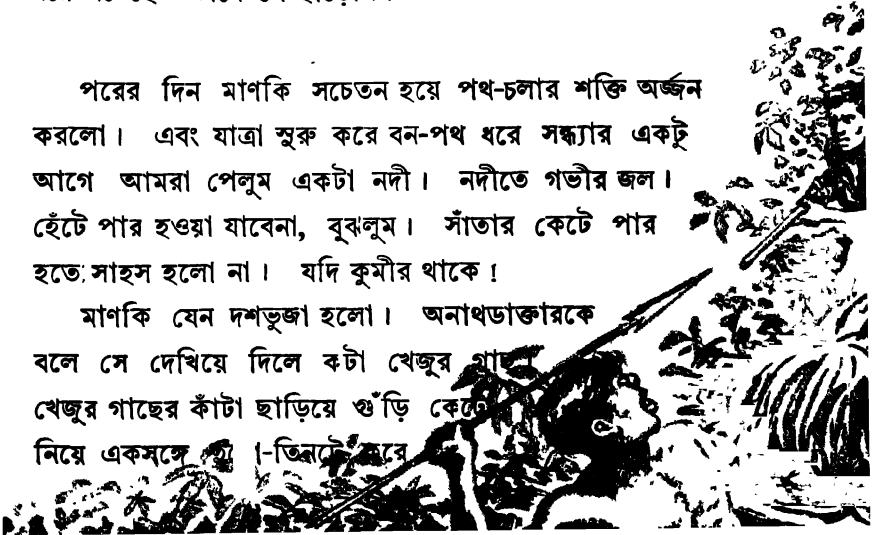
বাঁধা হলো…বনের লতা জড়িয়ে বেশ টাইট করে বাঁধন দিলুম। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগলো চারটে ভেলা তৈরি করতে।

তারপর সেই-ভেলা ভাসানো হলো …রাত তখন প্রায় দশটা…মাথার উপর আকাশে চাঁদ…মনের মধ্যে যত ভয় ছিল, চাঁদের জ্যোৎস্নায় সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ভেলায় চড়ে নদীর জলে ভেলা ভাসালুম। অনাথ ডাক্তার গান ধরলেন:

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে…'

নদীতে স্রোত বেশ প্রখর। সে-স্রোতে ভেসে চললুম…দূরে, কত দূরে। দুদিকে তীরে নিবিড় বন…ঝোপ-ঝাপ… বানরের কি দুপ্‌দাপ্‌ আর কিচিমিচি! তাদের রাজ্যে মানুষ ট্রেস্‌পাশার্স! তাদের চাঞ্চল্য জাগলো আমাদের আবির্ভাবে।

নদীর দেহ ক্রমে বিশীর্ণ হতে লাগলো…এবং এক জায়গায় এত বিশীর্ণ যে, ছোট নালার বেশে সে আমাদের ভেলার গতি রুদ্ধ করলো। তীরে উঠলুম। ভেলাগুলোর জন্য মায়া হতে লাগলো। এমন সহায় ফেলে যাবো?

অনাথ ডাক্তার বললেন,—ভেলা মাথায় নিয়ে চলা
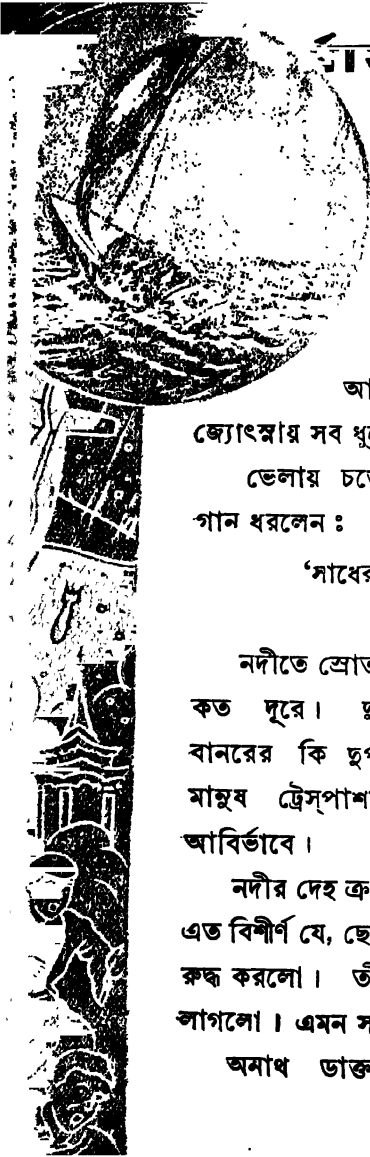
যাবে না তো! দরকার হয়, আবার নতুন ভেলা তৈরি করবো।

সে কথা ঠিক। ভেলায় সম্ভ আরাম পেয়ে এ-কথা মনে জাগেনি!

তাই হয়। অতি-দুঃখে অভিভূত হলে মানুষের চিন্তা-শক্তি যেন লোপ পায়! অতি-দুঃখের পর সুখের স্বাদ পেলেও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অভিভূত থাকে—সুতরাং ভেলার সম্বন্ধে এই সহজ কথা মনে জাগেনি বলে আমার একটুও লজ্জা হলো না।

ডাঙ্গায় উঠলুম। ডাঙ্গা মানে, মহারণ্য!

ডাঙ্গা পেয়ে জলযোগাদির ব্যবস্থা। কেরোসিন আর নেই। মাণকি কাঠকুঠো সংগ্রহ করে এনে উনুন জ্বালার ব্যবস্থা করলো।

তার তৎপরতা দেখে আমি ভাবছিলুম, অজানা কোন্ না-জানা জাতের মেয়ে···আমরা কারা···কি আমাদের অভিপ্রায়···কোথায় চলেছি···এ-সবের কোনো সংবাদ জানেনা···তবু আমাদের জন্য ওর এ দুশ্চর তপস্যার কারণ কি? আমাদের উপর এমন মায়া যে, চিরদিনের ঘর-বাড়ী-ভুঁই আপন-লোক···হয়তো মা-বাপকে ছেড়ে চলে এলো কেন?

কাকেই বা প্রশ্ন করবো? ওর ভাষা যদি বুঝতুম, ওকে আমি নিশ্চয় এ-কথা জিজ্ঞাসা করতুম। অনাথ ডাক্তারকে
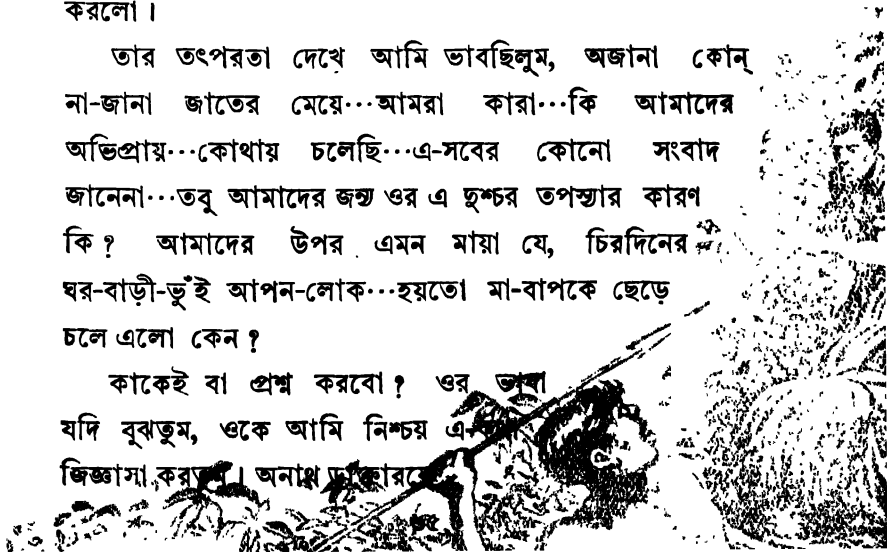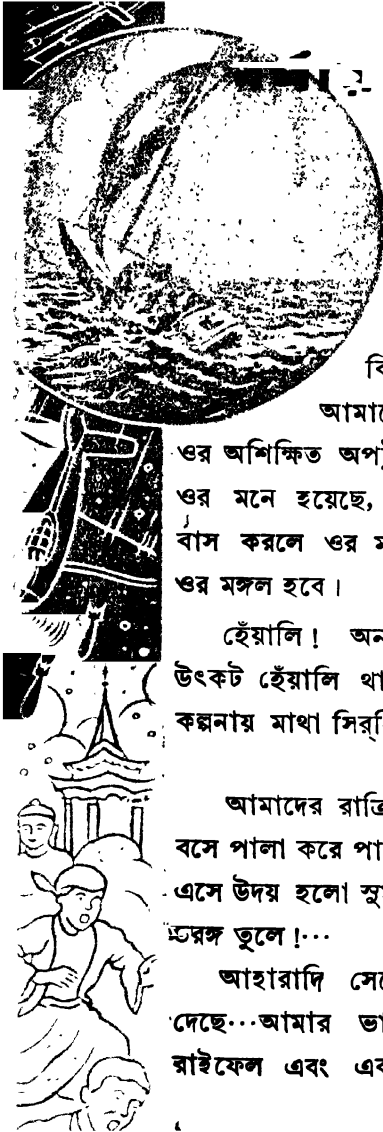
দু'চারবার কৌতূহল জানিয়েছিলুম···অনাথ ডাক্তার শুধু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন—মানুষের মনের সংবাদ কে কবে সঠিক জানতে পেরেছে, বলুন বীরুবাবু? আমার মনেও কি কৌতূহল হচ্ছে না? কিন্তু চুপ করে আছি। তবে মনে হয়, আমাদের মধ্যে এমন-কিছুর সন্ধান ও পেয়েছে ওর অশিক্ষিত অপটু মনের কোনো বৃত্তির সাহায্যে···যাতে ওর মনে হয়েছে, এতকাল যেখানে বাস করছিল, সেখানে বাস করলে ওর মঙ্গল হবে না···আমাদের সঙ্গে থাকলে ওর মঙ্গল হবে।

হেঁয়ালি! অনাথ ডাক্তারের কথার মধ্যে এতরকমের উৎকট হেঁয়ালি থাকে যে, সে-সবের অর্থ উদ্ধার করবার কল্পনায় মাথা সির্‌সির্‌ করে ওঠে।

আমাদের রাত্রি কাটলো মশাল জ্বেলে···মশারির ক্যাম্পে বসে পালা করে পাহারাদারি আর নিদ্রা। এবং পরের দিন এসে উদয় হলো সুমধুর এবং প্রচুর সম্ভাবনা-ভরা আশার তরঙ্গ তুলে!···

আহারাদি সেরে সকলে বিশ্রাম-সুখে দেহ-মন ঢেলে দেছে···আমার ভালো লাগলো না সে আলস্য-বিলাস···রাইফেল এবং একটা মোটা লাঠি সম্বল করে আমি

বর্ম্মায় যখন বোম পড়ে

চললুম বনের পথ ধরে। ঘুরে এদিক-ওদিক দেখবো—এই ছিল উদ্দেশ্য।

কতদূর এসেছি খেয়াল ছিল না··হঠাৎ দেখি, দুটো চোখ! মানুষের চোখ! বনগুল্মের মাঝে দাঁড়িয়ে জীর্ণ শীর্ণ আকারের একটি নর-মূর্ত্তি···তার মাথায় লম্বিত জটাজুট। মুখে গোঁফ-দাড়ির ঘন জঙ্গল···আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ বাহু···করপল্লবে নখ যা দেখলুম, সে-নখে বোধহয় সবল স্থূলোদর সর্ব্ব-জীবকে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেলতে পারে! মানুষ? না, বনবাসী গরিলা?··· পরণে কাপড় নেই। বনের লতায়-পাতায় গায়ে খানিকটা আবরণ মাত্র—তাতেই লজ্জা রক্ষা!

কিছু বুঝতে পারলুম না!···লজ্জা আছে বোঝা গেল শুধু তার ঐ লতায়-পাতায় আবরণ রচনা দেখে! গরিলা নয়! তবু প্রাণ বাঁচাবার জন্য রাইফেল তুলে তার দিকে তাগ করলুম···

পরিষ্কার ইংরিজী ভাষায় মূর্ত্তি বললে,—Take off your gun···বন্দুক নামাও।···

চমকের আর সীমা নেই!···মানুষই বটে! ইংরিজী কথা কয়! সভ্য-সমাজের জীব তাহলে!

বন্দুক নামালুম···কিন্তু হুঁশিয়ার রইলুম। তার হাতে অস্ত্রশস্ত্র নেই! কিন্তু হাতের পেশী বেশ সবল। কাছে এসে যদি হাতাহাতি যুদ্ধ করে? অঙ্গে আবরণ নেই,
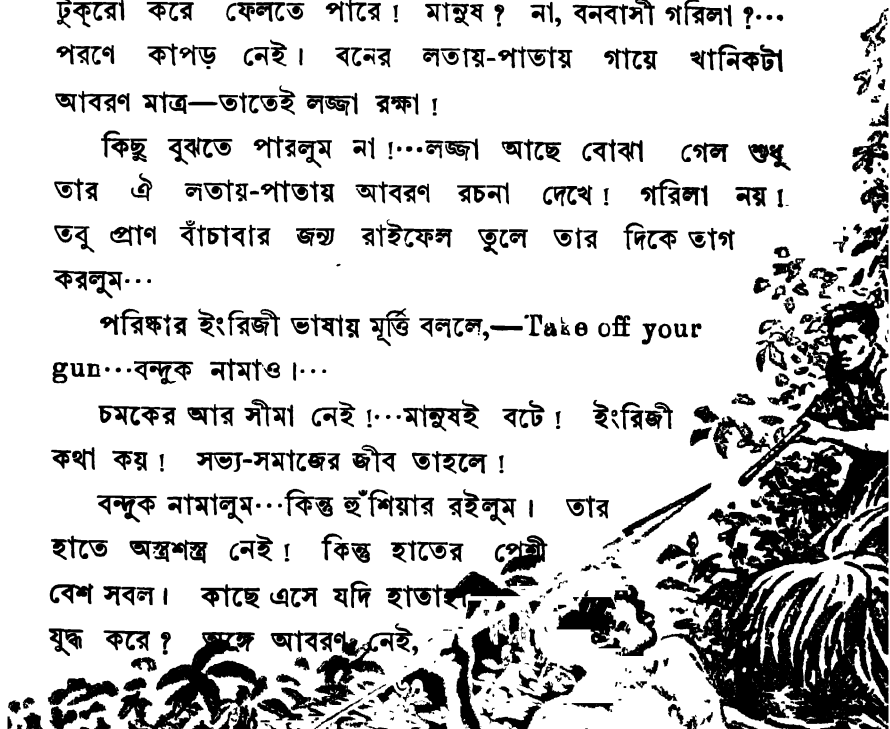
বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

আচ্ছাদন নেই···কাজেই বুঝলুম, অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখেনি !

সে কাছে এলো···স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তার পরে বললে—ইংরিজী ভাষায় কথা বললে। যা বললে, তার অর্থ··

আরো একজন মানুষ তাহলে এ-বনে এলো !

সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা নিশ্বাস। সে-নিশ্বাসে, মনে হলো, তার নিঃসঙ্গ নিরালা-জীবনের সঞ্চিত বহু সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা বুকের কোটর ছিট্‌কে ঝরে পড়লো !

বিচিত্র গম্ভীর তার কণ্ঠ। আমার মনে হচ্ছিল, বঙ্কিম-বাবুর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সেই কাপালিককে।···এ-বনে কাপালিকের আস্তানা আছে তাহলে ? কিন্তু ইংরিজীতে কথা বলে···ইংরেজ-জাত কাপালিক হতে পারে না।··· ভারতবাসী হলে বাঙলা কিম্বা হিন্দীতে কথা বলতো। কিম্বা আমার পরণে খাকী শর্ট, খাকী সার্ট, মাথায় খাকী হ্যাট···আমায় ভেবেছে, আমি ভারতবাসী নই···তাই বোধ হয় ইংরিজীতে কথা কয়েছে !

আমি প্রশ্ন করলুম—তুমি কি-জাতের মানুষ ?

সে জবাব দিলে—আমার আবার জাত কি ! আমি এখন বুনো-জাতের সামিল। মা-বাপের ভাষা যে ভুলে যাইনি···তা আজ সাত বছর পরে তোমার সঙ্গে কথা কয়ে

জানতে পারলুম। সাত বছর কারো সঙ্গে একটি কথা কইনি। কথা কইবো কি, একজন মানুষকেও চক্ষে দেখিনি - পূরো সাত-সাতটি বছর। কল্পনা করতে পারো, মানুষের এমন অবস্থা ?

আমার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ···নিরুত্তরে তার পানে চেয়ে রইলুম। চোখের সামনে এত বড় জীবন্ত ট্রাজেডি কখনো প্রত্যক্ষ করবো বলে ভাবিনি! এমন কথা যেমন কারো মুখে কখনো শুনিনি, তেমনি কোনো গল্প-উপন্যাসেও এমন কাহিনী পড়বার সৌভাগ্য আমার আজপর্য্যন্ত ঘটেনি! নিরালা দ্বীপে ছিল সেক্সপীয়রের মিরান্দা···মিরান্দার বাবা প্রস্‌পারো ছিল সঙ্গে! বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাও মানুষ দেখতো···কাপালিককে, অধিকারীকে! আর এ ?

লোকটি বললে,—Follow me···(আমার সঙ্গে এসো)

গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো! কপালকুণ্ডলা-উপন্যাসের কাপালিকও বলেছিল নবকুমারকে—মামনুসর! এও ঠিক সেই কথা বলে! এর মানে ?

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? কেন নিয়ে যাবে! তাছাড়া আমি যাবোই বা কেন? ভিতর থেকে আমার মন যেন পা' দুখানাকে চেপে ধরে বলে উঠলো - না, খবর্দ্দার, যেয়ো না ওর সঙ্গে। যে-মানুষ সাত বছর বনে বাস করছে···সাত বছর যখন মানুষের মূর্ত্তি ছাখেনি, তখন কি ও আর মানুষ আছে? বনে বাঘ ভালুকের সঙ্গে
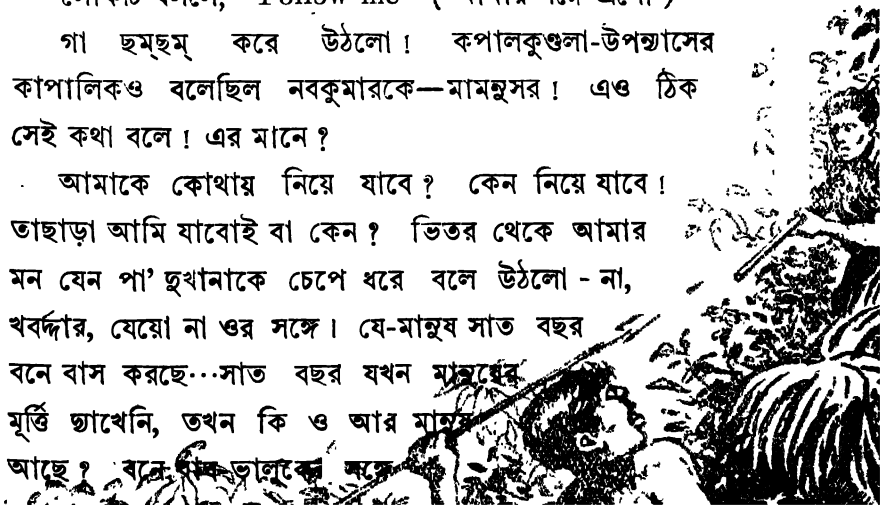
বাস করে' তাদের মত হয়েছে! ওর সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি? মানুষ হলেও ও পাগল! পাগলের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? বুনোদের হাত থেকে যদি বা লুকিয়ে-লুকিয়ে কোনোমতে নিস্তার মেলে তো পাগলের হাতে নিস্তার পাবার তিলমাত্র সম্ভাবনা নেই! থাকতে পারে না!

তবু ভয়ে বলতে পারলুম না যে, না, আমি যাবো না!···

হঠাৎ পিছু হঠলুম, ভাবলুম, সরে পড়বো···যে-পথে এসেছি, সেই পথে।

কিন্তু তা হলো না। লোকটা সবলে আমার হাত চেপে ধরলো! হাতে তার কি জোর! মনে হলো, আমার হাত বুঝি গুঁড়ো হয়ে যাবে! এমন আচমকা ধরলো যে আমার হাত থেকে বন্দুকটা খশে' পাশে পড়ে গেল। লোকটা পায়ের ঠোক্করে বন্দুকটাকে দিলে অনেকখানি দূরে ঠেলে! তারপর দু' চোখে তার কেমন এক-রকম দৃষ্টি! সে বললে,—নিশ্চয় তুমি আসবে আমার সঙ্গে···এসো।

লোকটা যেন যাদুকর! তার স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে গেল! মনে হলো, আমার নিজের কোনো শক্তি নেই···আমি অবশ! যেন ওর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! ওর কথা মেনে আমাকে চলতেই হবে—তাছাড়া উপায় নেই!
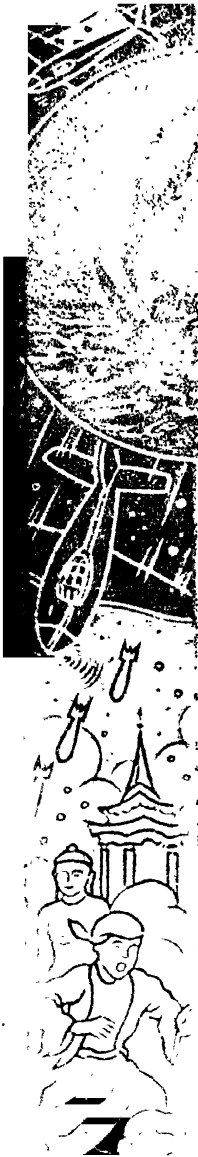
বর্মায় যখন বোম পড়ে

তোমরা বিশ্বাস করবে না···আমার মনের তখন সম্পূর্ণ বিকল-অসহায় অবস্থা···আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা একেবারেই ছিল না! 'মন্ত্র চালা'—কথাটা শুনেছি···তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না! আমি সেই মন্ত্র-চালিতের মতো লোকটির সঙ্গে সঙ্গে চললুম।

———
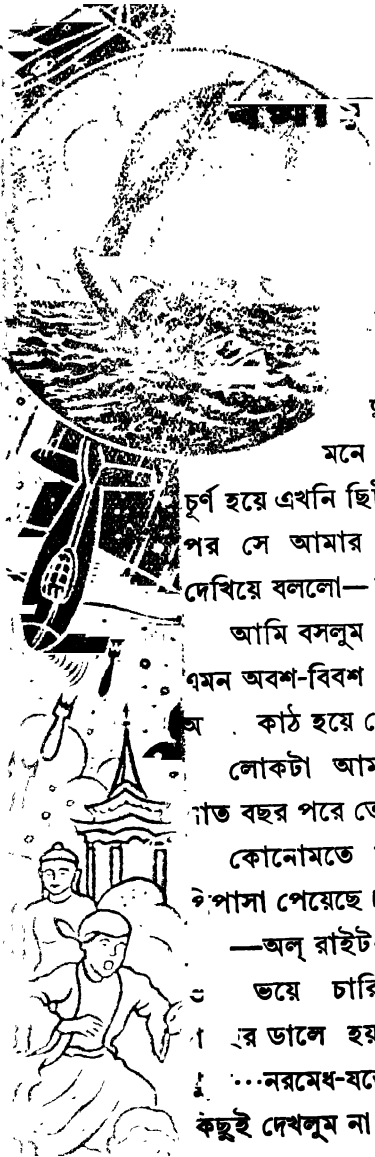
সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমার হাত ধরে কতদূর যে সে চললো, তার হিসাব দিতে পারবো না। আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা এমন বেগে দুলছিল যে তার সে-দোলার শব্দে আমার মনে হচ্ছিল বুঝি হৃৎপিণ্ডটা বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে এখনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে! অনেক দূর চলার পর সে আমার হাত দিল ছেড়ে এবং একটা ভাঙ্গা ঢিপি দেখিয়ে বললো—বসো!

আমি বসলুম! দাঁড়াবার মতো জোর পায়ে ছিল না। এমন অবশ-বিবশ ভাব! সে-এক বিচিত্র অনুভূতি! ভয়ে অ . কাঠ হয়ে গেছি!

লোকটা আমার ভয় বুঝলো···হেসে বললে—ভয় নেই! াত বছর পরে তোমাকে আজ প্রথম দেখলুম···একজন মানুষ!

কোনোমতে শক্তি সংগ্রহ করে আমি বললুম,—বড্ড পাসা পেয়েছে। জল খাবো।

—অল্ রাইট···বলে সে-লোকটা গেল বনগুল্মের আড়ালে।

ভয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে আমি দেখতে লাগলুম— ৃর ডালে হয়তো দেখবো মানুষের জীর্ণ কঙ্কাল···মাথার ···নরমেধ-যজ্ঞের রোমাঞ্চকর নিদর্শন! কিন্তু সে-সব কছুই দেখলুম না।

বর্মায় যখন বোমা পড়ে

পাখীর গান শুনলুম···কোথায় কোন্ গাছের ডালে বসে পাখী গান গাইছিল। মনে হলো, এ-গান যেন শুনেছি সেই কত বছর আগে···আমার বাঙ্লা-মায়ের বুকে যখন বাস করতুম, তখন। পাখীর ডাক এত ভালো, এমন মিষ্টি এর আগে কখনো মনে হয়নি!

লোকটা ফিরলো···সন্থ-ছেঁড়া গাছের বড় পাতার পুটে জল নিয়ে। আমায় দিল! জল খেলুম। কি আরাম যে পেলুম। আঃ!

সে বললে,—আরো জল চাই?

মাথা নেড়ে জানালুম,—হ্যাঁ।

আবার সে জল নিয়ে এলো···পত্র-পুটে। পান করে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলুম। মনে হলো, আয়ু নিঃশেষ হয়ে এসেছিল···গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপে জীর্ণ মলিন চারা-গাছ যেমন জল পেয়ে প্রাণ পায়, এ-জলে আমার প্রাণপুষ্প তেমনি মৃত্যুর হাত থেকে এ-যাত্রা বেঁচে উঠলো!···

খানিক পরে লোকটা বললে—কাঠের ব্যবসা করো বুঝি? এ-বনে কাঠের সন্ধানে এসেছো?

আসল কথা গোপন করে সেই কথাতেই সায় দিয়ে বললুম,—হ্যাঁ।

লোকটা বললে—কাঠ এখানে অজস্র। শুধু কাঠ আর কাঠ! গাছ কাটো

কাঠ নিয়ে ··· । কিন্তু এত ···
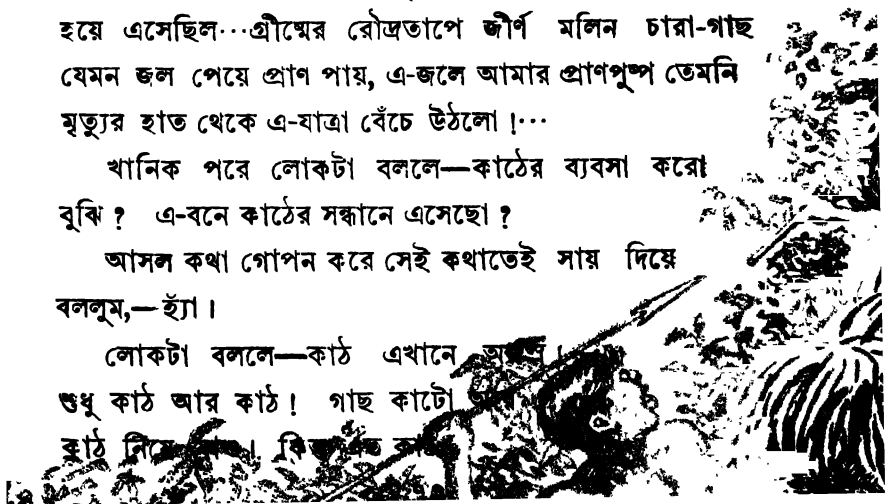
নিয়ে কি করবে, বলতে পারো? কাঠ তো ওদিকে আছে...সে-কাঠ ছেড়ে এই দুর্গম বনে এসেছো কাঠের জন্য! পাগলামি আর কাকে বলে! আচ্ছা, কত কাঠ কেটে জড় করলে?

বললুম,—দেখে বেড়াচ্ছি......তারপর রিপোর্ট করবো...কোন্ বনে কি-জাতের কাঠ কত মিলতে পারে, তার রিপোর্ট। তারপর যেমন ফরমাশ হবে, তেমনিভাবে কাঠ কাটবো। আমার সঙ্গে আমার লোকজন আছে...নদীতে।

সে কোনো জবাব দিল না...চুপ করে রইলো। মনে যেন তার নানা চিন্তার উদয়াস্ত-লীলা চলেছে!

অস্বস্তি বোধ করছিলুম। ভাবছিলুম, একে বলে, সাধ করে বিপদ ডেকে আনা। ওরা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে...এ-দুর্দ্দিনে সে-বিশ্রাম যেন স্বর্গ-সুখ! আর আমি এলুম একটা দুরন্ত খেয়ালী সখ নিয়ে বন দেখতে! এখন এ খেয়ালের পরিণাম...

দূরের একটা গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে লোকটা বললে—ও-গাছটা কি-গাছ, জানো?

দেখলুম। বললুম—মেহগ্নি।

—তাই। যাও তো ঐ মেহগ্নি গাছের কাছে।...যাও...

কণ্ঠে আদেশের সুর। উঠতে হলো। এগিয়ে চললুম

মেহগ্নি গাছের দিকে। আমার বন্দুক ছিল কাপালিকের হাতে··· ভাবলুম, মি কেড়ে! নিয়ে···

হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে উঠলো···কিন্তু নিতে পারলুম না।

চললুম এগিয়ে কাপালিকের অনুজ্ঞামত। পিছনে শুনলুম, পায়ে চলার শব্দ। বুঝলুম, কাপালিকও পিছু-পিছু আসছে! মনের মধ্যে যা হচ্ছিল···একে তো পলায়ন-পর্ব্ব সুরু হয়ে-ইস্তক এ্যাড্‌ভেঞ্চারের নব-নব পর্য্যায় চলেছে অবিরাম, তারপর এখানে আবার···

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের উপর মনের যত আকর্ষণ ছিল, সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে!

মনে শুধু একটা প্রশ্ন জাগছিল···সে-প্রশ্নের আবর্ত্তে আর সব চিন্তা মিলিয়ে অদৃশ্যপ্রায়! মনে প্রশ্ন জাগছিল···এ পাগল? না···

কী? কে এ?

মেহগ্নি গাছের সামনে এসে দাঁড়ালুম। পিছনে কাপালিকের আদেশ জাগলো—Move on···(আরো আগে চলো)।

চললুম। কতক্ষণ···বলতে পারি না! এক-একবার মনে হচ্ছিল, বুঝি স্বপ্ন দেখছি! মানুষ এমন করে পরের হাতে পুতুল হতে পারে [illegible] অসম্ভব!

সে-অস[illegible] সম্ভব [illegible]
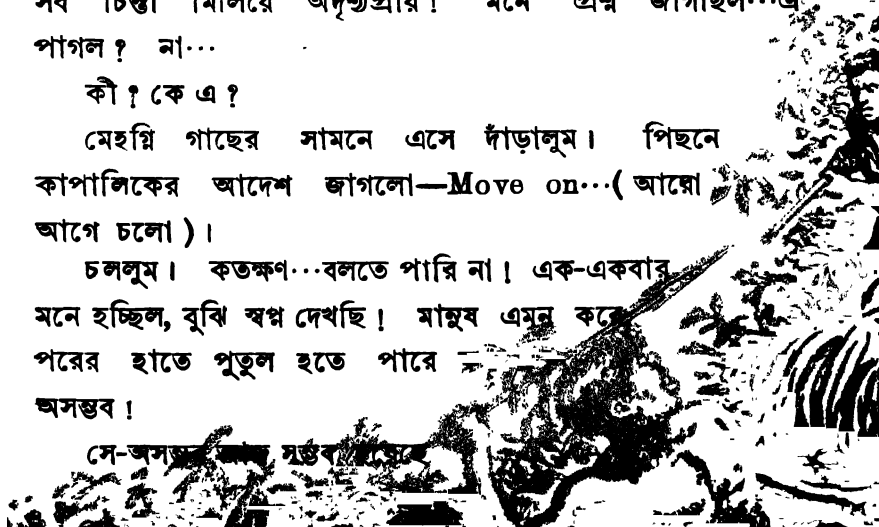
বন্যায় যখন বাসা পড়ে

…হায়রে, স্থান-মাহাত্ম্যে! - চলে-চলে ব্যথায় পা আতুর হলো। মাথার উপর সূর্য্য আর ধৈর্য্য রক্ষা করতে না পেরে অস্তাচলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলো…

আমরা নদীর ধারে এসে পৌঁছুলুম। বোধহয়, সেই নদী…ভেলার বুকে ভর দিয়ে যে-নদী পার হয়ে এদিককার তীর-ভূমিতে এসে উঠেছি! সন্ধ্যার অন্ধকার নামছিল…নদীর তীরে দুটো কুমীরের বিরাট দেহ! যেন কাঠের দুটো কুঁদো! আমাদের দেখে তাদের দেহে গতির দোলা লাগলো…তারা চললো জলের দিকে! আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সেই দোলন আবার সুরু হলো। অস্থির হয়ে কাপালিকের দিকে চেয়ে আমি প্রশ্ন করলুম,—কি চাও তুমি?…আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?

কাপালিক বললে,—রাত্রি আসন্ন। বনে থাকা নিরাপদ নয়। আমার আশ্রয়-কুটীর এইখানে। খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রে বিশ্রাম করো। কাল দিনের বেলায় কত রকমের কাঠ দেখতে চাও, দেখাবো। দামী দামী কাঠ…

বুঝলুম, প্রতিবাদ মিথ্যা হবে। সাত বছর পরে মানুষের দেখা পেয়েছে! ও কি আমাকে সহজে ছাড়বে?

আহার হলো…ফল। আহারের পর কাপালিক বললে,—ঢোকো ঐ ঘরে…ঢুকে শুয়ে পড়ো! পাতার বিছানা আছে।

ঘর মানে, ক'টা খুঁটির মাথায় তাল-খেজুর পাতার ছাউনি··· মাটির দেওয়ালও আছে তিন দিকে···মাথাভোর উঁচু।

শয়ন করতে হলো। কাপালিক এসে শুয়ে পড়লো আমার পাশে।

অস্বস্তিতে গা রী-রী করতে লাগলো। এত অস্বস্তি হলে কি ঘুম হয়? আমারো চোখে ঘুমের দেখা নেই···

প্রহরের পর প্রহর ধরে রাত্রি চলেছে এগিয়ে! শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম নিজেদের দলের কথা। আমাকে না পেয়ে কি যে তারা করছে! হয়তো ভেবেছে, আমার জীবনে যবনিকা-পাত হয়ে গেছে! হয়তো ভাবছে···

কি যে ভাবছে আর কি না ভাবছে···এ-চিন্তা জট পাকিয়ে আমার মাথাটাকে এমন করে তুললো যে, চিন্তা করবার ধারা ক্রমে মিলিয়ে একাকার হয়ে গেল। পাশে যেন মেঘ ডাকছে ···এমন শব্দ! কাপালিকের নাক ডাকার শব্দ! বুঝলুম, গাঢ় নিদ্রায় সে অভিভূত।

ভাবলুম, এই ঠিক অবসর! এখান থেকে পলায়নের এমন সুযোগ আর হয়তো মিলবে না! কিন্তু পিস্তল? আমার পিস্তল? সতর্কভাবে হস্ত চালনা করে বুঝলুম, কাপালিক সেটা মাথার নীচে রেখেছে! টানতে গেলে যদি জেগে ওঠে··· বুঝবে, পালাবার চেষ্টা করছি!
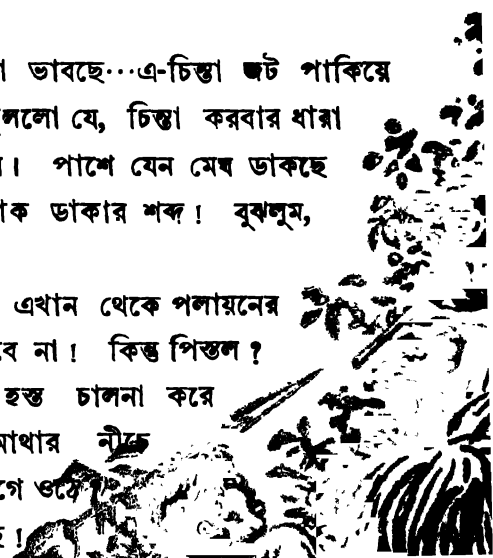
এবং যদি তা বোঝে, ও কি আমাকে আস্ত রাখবে!

পিস্তল পাওয়া যাবে না। চুপ করে শুয়ে রইলুম! শুয়ে শুয়ে কাপালিকের নাসিকা-ধ্বনি শুনতে লাগলুম! তন্দ্রার ঘোর লাগছিল। তন্দ্রার ঘোরে মনে হচ্ছিল যেন ট্রেণে চড়ে চলেছি নিজের দেশে··· চির-বাঞ্ছিত বাঙ্‌লা-মায়ের কোলে। নাসিকা-ধ্বনিতে চলন্ত ট্রেণের শব্দ···

হঠাৎ সে শব্দ থেমে গেল। কাপালিক উঠে বসলো; বললে,— ঘুমোচ্ছ?

তার কথায় তন্দ্রা গেল ভেঙ্গে। সাড়া দিলুম না। সাড়া দিলে কি জানি আবার কি হুকুম করে বসবে! নিঃশব্দে কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম।

কাপালিক উঠলো এবং নিঃশব্দে পর্ণাশ্রয় ছেড়ে বাইরে গেল। কাণ খাড়া করে শুনলুম···যদি পায়ের শব্দ পাই!

শুনলুম শব্দ! বুঝলুম, আশ্রয়ের বাইরে সে পায়চারি করছে! হয়তো মনে মনে ভয়ঙ্কর কোনোরকম অভিসন্ধি আঁটছে! আমাকে বোধহয় পুড়িয়ে খাবে! নাহয়··· কি? কি? ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ পাথর হয়ে এলো!

পরের দিন সকালে ভোরের আলো ফুটলো···সে-আলোয়

বর্ষায় যখন বামা পড়ে

ঘুমে আমার দু' চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এলো! আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।...

ঘুম ভাঙ্গলো সূর্য্যের তপ্ত প্রখর রৌদ্র লেগে। বেরিয়ে এলুম। দেখি, বাইরে কাপালিক বসে আছে...একগাদা ফল সংগ্রহ করেছে।

দিনের আলোয় তাকে ভালো করে দেখলুম। দেহের বর্ণ পোড়া কাঠের মতো...মাঝে-মাঝে গৌর রঙের আভাস। পায়ে অসংখ্য ছড়া-কাটা-ফাটার দাগ।

কাপালিক বললে,—এসো, খেতে বসো।

আমি বললুম,—আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন? কেনই বা আমাকে আটকে রাখছো? তোমার কি মতলব?

কাপালিক আমার পানে চেয়ে রইলো...নিরুত্তরে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। আমার গায়ে ক্ষণে-ক্ষণে কাঁটা দিচ্ছিল· জবাবে যদি বলে—বলি দেবো?...

কিন্তু সে-জবাব সে দিল না। কাপালিক বললে—আমি তোমাকে ধরে রাখিনি। তোমার যেখানে খুশী তুমি যেতে পারো। তারপর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সে দেখালো বনের দিকে; বললে,—তুমি ঘুমোচ্ছিলে, দেখলুম। তোমার লোকজন ভাবছে, তুমি হারিয়ে গেছ! তুমি বললে, কাঠ দেখে বেড়াচ্ছ বনে-বনে· কিন্তু তার প্রমাণ?

জবাব দিলুম না। দ্বিধা-জড়িত
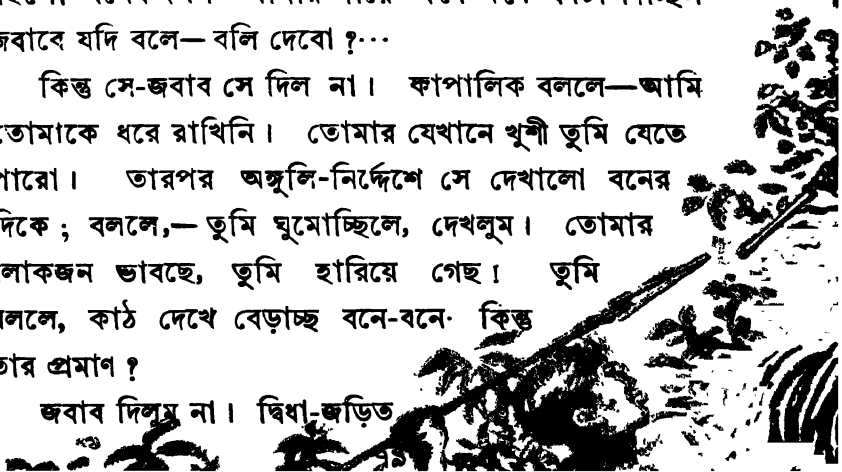
বর্মায় যখন বোমা পড়ে

দৃষ্টিতে তার পানে চাইলুম। সন্দেহ করেছে? কিন্তু কিসের সন্দেহ? ধন-রত্ন চুরি করতে মানুষ বনে আসে না, এ-কথা ও জানে।

কাপালিক বললে—বন কাকে বলে, জানো? দেখতে চাও যদি, চলো আমার সঙ্গে। এখান থেকে আধ মাইল পরে···দেখবে, কি ঘন জঙ্গল! সে-জঙ্গলে আছে বহুকালের জীর্ণ মন্দির। সে-মন্দিরে দেবতার মূর্ত্তি আছে···মস্ত বড়···কিন্তু জীর্ণ মূর্ত্তি!

বললুম—কি দেবতা···নাম জানো?

সে বললে—বুদ্ধ।

বললুম—এ-জায়গার নাম?

জবাব দিল না।

ফল খেতে হলো। তারপর এস্‌পার কি ওস্‌পার···চললুম কাপালিকের সঙ্গে জীর্ণ মন্দিরে বুদ্ধদেবের জীর্ণ বিগ্রহ-মূর্ত্তি দেখতে।

হঠাৎ যেন কামান দাগার শব্দ।···

চমকে উঠলুম!···

কাপালিক বললে—মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামবে!

আকাশের পানে তাকিয়ে দেখি, তাই···

দেখতে দেখতে অঝোরে বৃষ্টি নামলো। ঝড় দেখা দিল

না, তাই রক্ষা! সে-জলে বড় একটা গাছের নীচে আশ্রয় নিলুম দুজনে।

এত জল···মনে হলো, বুকে যত জল জমে আছে, নিঃশেষে যেন আকাশ তা পৃথিবীর বুকে বর্ষণ না করে বিরাম মানবে না!··

হঠাৎ কাপালিক বললে—দৌড়োও···পালাও···

বলে' এমন জোরে আমার হাত ধরে টানলো যে আমি ভয়ে একেবারে স্তম্ভিত! কাপালিক একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—দেখছো? ঐ···কি আসছে···

লক্ষ্য করে দেখি, মাইলের পর মাইল-প্রসারী মোটা গাছের গুঁড়ির মতো কি একটা সচল হয়ে তীরের বেগে আমাদের দিকে গড়িয়ে আসছে।

—পাহাড়ী সাপ?

কাপালিক বললে—বিষাক্ত পিঁপড়ের দল। লাইনে আছে অমন বিশ-পঁচিশ কোটি···ওরা সামনে সিধা চলে···হেলে না, বাঁকে না। সামনে কোনো জীবন্ত প্রাণী বা গাছ-পাথর পড়লে সে-সবের আর রক্ষা নেই! সরে পড়ো·· আমার পিছনে পিছনে এসো।

বলতে বলতে কাপালিক ছুটলো উর্দ্ধশ্বাসে বাঁ-দিকে। আমিও তার পিছনে দিলুম দৌড়···যত বেগে পারি, তেমনি বেগে

পনেরো মিনিট দৌড়ের পর
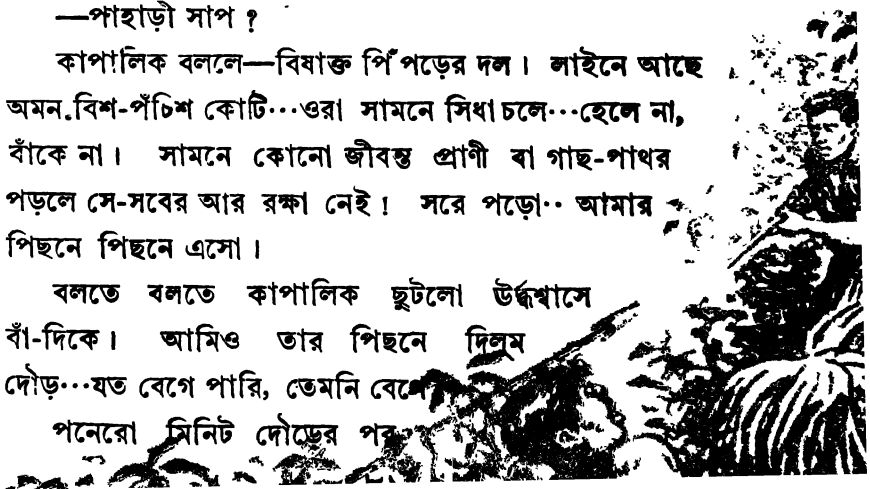
থামা হলো।...যেখান থেকে ছুট সুরু করছিলুম, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে কাপালিক বললে,—ঐ ছাখো, পিঁপড়ের লাইন চলেছে...

যেন কালো রঙের মস্ত একটা ঢেউ চলেছে বনের বুক বয়ে গড়িয়ে! ছোট ছোট গাছপালাগুলো তাদের চলার বেগে রুখে দাঁড়াতে পারছে না...তাদের সঙ্গে সেগুলোও চলেছে...তুমড়ে মচ্‌কে ভেঙ্গে-চুরে তাল-গোল পাকিয়ে।

বৃষ্টির বেগ কমলো। কাপালিকের নির্দ্দেশে আবার চলা সুরু হলো।

জীর্ণ মন্দিরের কাছে এসে পেঁাছুলুম। তখন প্রায় অপরাহ্ণ বেলা। পাছুটো এমন টাটিয়ে উঠেছে যেন বিষফোড়া!...

খানিকক্ষণ বিশ্রাম না করে উঠতে পারলুম না।

যখন উঠলুম, কাপালিক বললে—দেখবে, এসো...

মন্দিরে ঢুকলুম। প্রকাণ্ড বিগ্রহ! মাথার অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! যেখানটা ভেঙ্গে গেছে, সেখানটায় মস্ত গহ্বর! বিগ্রহের মাথার সে গহ্বরের মধ্যে কাপালিক হাত ঢুকিয়ে দিলে...হাত ঢুকিয়ে বার করলো মুঠো-মুঠো চুনী পান্না, সোনার মোহর...একটা রাজার ঐশ্বর্য্য!

বর্ম্মায় যখন বামা পড়ে
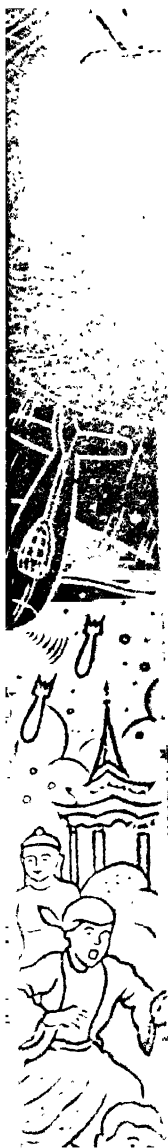
কাপালিক বললে—আমার বাড়ী ইংলাণ্ডের ক্রয়ডেন সহরে। গাছ-গাছড়ার উপর আমার প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল। গাছের ডাকে ভারতবর্ষে এসেছিলুম। সেখান থেকে আসি বর্ম্মায়। আমার স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন। বর্ম্মায় এসে বনে-বনে ঘোরা ছিল আমার কাজ। এ-বনে যখন আসি, তখন এখানকার লোকজন আমাকে অনেক মানা করেছিল···বলেছিল, দৈত্য-দানার বন···অভিশাপে ভরা। বলেছিল, এ-বনে এলে ফেরা যায় না—কেউ ফেরেনি! সে-কথা না মেনে আমি বনে এলুম। স্ত্রী এলেন সঙ্গে। নানা জাতের দামী কাঠ দেখে নিশানা করছিলুম···তারপর দেখলুম এই মন্দির। মন্দিরের গল্প শুনেছিলুম···শান ডাকাতের দল বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি গড়েছিল। তাঁর জন্য মন্দির তৈরি করেছিল। বুদ্ধ-মন্দির বলে কারো সন্দেহ হবে না···এ তাদের তোষাখানা! রাজার ধন-রত্ন লুঠ করে এনে এই মন্দিরে রাখতো···মূর্ত্তি ফাঁপা, তার ভিতরে তোষাখানা। এর মাথার উপর ডালা ছিল। সেই ডালা খুলে লুঠের ধন-রত্ন ঢালতো···

একবার সর্দ্দারে-সর্দ্দারে হলো ভীষণ ঝগড়া এই ধন-রত্নের অংশ নিয়ে। তুজনে সাংঘাতিক দাঙ্গা। সে দাঙ্গা থেকে বিগ্রহ রক্ষা পেলো না। তুই সর্দ্দারই দাঙ্গায় মারা গেল···দল হলো ছত্রভঙ্গ।···তারা বন ছেড়ে সংসার-সুখের বাসনায় যে যা পারে লুঠের মাল

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

নিয়ে বন ছেড়ে পালালো।...এ-গল্প আমি শুনেছিলুম আমার এক বর্ম্মীজ বাবুর্চ্চির কাছে।...এ-বনে আমিও ধন-রত্নের সন্ধান করেছিলুম। বিগ্রহ-মূর্ত্তির মাথা ফাটিয়েছিলুম আমি...আমার স্ত্রী বহু রত্ন উদ্ধার করেন...রত্ন নিয়ে দেশে ফেরবার জন্য তিনি আকুল হলেন। এত ঐশ্বর্য্য নিয়ে সমাজে না ফিরলে ঐশ্বর্য্যের কি দাম? নিয়ে লাভই বা কি? স্ত্রী অস্থির হলেন...কোনোমতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলুম না। স্থির হলো, পরের দিন সকালে আমরা বন ছেড়ে চলে যাবো। কথা রইলো, তাঁকে রেঙ্গুনে পেঁাছে দিয়ে আমি ফিরে আসবো বনে...বাছাই-করা দামী কাঠ কেটে নিয়ে যাবার জন্য...

এইপর্য্যন্ত বলে কাপালিক চুপ করলো। পুরাকালের কাহিনী বলতে বলতে তার কণ্ঠ অশ্রুর বাষ্পে বিজড়িত হয়ে এসেছিল।

আমি নিঃশব্দে নির্ভয়ে তার পানে চেয়ে রইলুম...

খানিক পরে কাপালিক আবার সুরু করলো বলতে—শেষ-রাত্রে পৃথিবী কাঁপিয়ে মেঘ গর্জ্জন করে উঠলো...আকাশ ফাঁশিয়ে ঝরে পড়লো বৃষ্টির ধারা! বৃষ্টির সে কি প্রবল বেগ! সে-বৃষ্টিতে...

এ-বন নিমেষে জলময় হয়ে উঠলো। আমাদের ছিল

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে
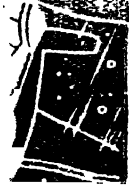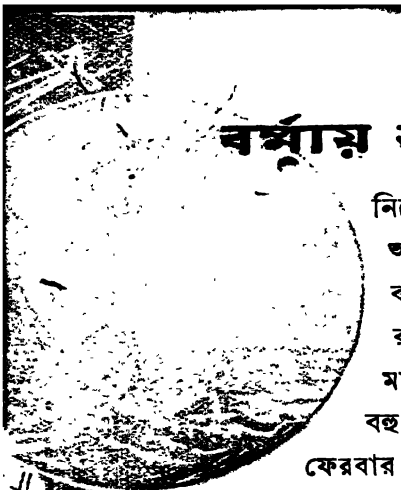
ছোট্ট একখানি বাংলো-বাড়ী। সে-বাড়ী জলে জলময়! স্ত্রী তাঁর জড়ো-করা ধন-রত্ন নিয়ে সেগুলির রক্ষা-কল্পে কি করবেন, কোথায় যাবেন···আকুল···অধীর···

এমন সময় হুড়মুড় করে বাড়ীর ছাদ দেওয়াল ভেঙ্গে পড়লো। স্ত্রী তার নীচে চাপা পড়লেন। যখন তাঁর দেহ উদ্ধার করলুম, তখন তাঁর প্রাণ দেহ থেকে বিনির্গত হয়ে গেছে!···

পরের দিন দুপুরে ঝড়-জল থামলো···তার পরের দিনটাও সে-জল ঠেলে কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় নি।

স্ত্রীকে সমাধি-শয়নে রেখে বিগ্রহের মণি-রত্ন নিয়ে ফিরিয়ে রেখে এলুম বিগ্রহের জঠর-কোটরে···

তারপর আর অন্য কোথাও যাবার কথা মনে জাগেনি। একা এই বনে কাটছে আমার দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ···পর-পর এমনিভাবে সাত-সাত বছর কাটলো! সাত বছর এ-বনে জীবন্ত প্রাণীর মুখ দেখিনি। সাত বছর পরে মানুষ দেখলুম তোমাকে···এই প্রথম! দেখে অনেকখানি আনন্দ হয়েছিল···কিন্তু আনন্দের চেয়ে ভয় অনেক বেশী। তাই তোমাকে এ-মন্দির দেখাবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা এইজন্য যে, ওরা যে-কাহিনী বলে, এ-বনে অভিশাপ আছে··· এ-বনের কোনো-কিছু নেবার লোভ করলে মৃত্যু··· শোচনীয় মৃত্যু সুনিশ্চিত···দেশের লোক [illegible] এ-কাহিনীতে যত কুসংস্কার থাকুক ··· হয়, সে-কুসং[illegible]রের ভিত্তি [illegible]
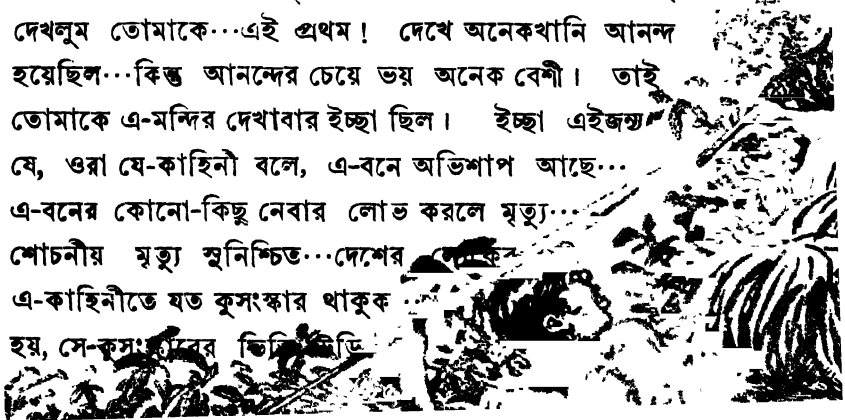
দেওয়া চলে না। এর বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করবার মতো জ্ঞান আমরা আজো লাভ করিনি! অনুশীলন করতে-করতে হয়তো একদিন এ-সংস্কারের বৈজ্ঞানিক কারণ আমরা জানতে পারবো!

এখন আমার কাহিনী শোনবার পরে হয় তোমার লোভ···এ-বনের কাঠ নিয়ে গিয়ে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ লাভের? আমি পারিনি। যদি বলো, সব হারিয়ে সাত বছর কিসের লোভে, কিসের মায়ায় তবে এ-বনে পড়ে আছি, তাহলে তার উত্তরে বলবো···এ-বনের মায়া আমার মজ্জায়-মজ্জায় মিশে গেছে। আমি যা দেখছি, যা উপলব্ধি করছি···সেই-সব তথ্য লিখছি। হয়তো এ-সবে পৃথিবীর কোনো লাভ হবে না, তবু আমি লিখি।

আমি বললুম—এ-বন থেকে চলে গিয়েও তো লিখতে পারেন!

তিনি বললেন,—এ-বন থেকে বেরুবার ইচ্ছা নেই। বনের বাইরে সেই সভ্য সমাজ! আশা-বাসনা লোভ-অহঙ্কারে ভরা সমাজ।···তার চেয়ে এ-বনে শান্তিতে আছি। বনে বাস করে বুঝেছি, শান্তির চেয়ে কামনার সামগ্রী জীবনে আর নেই এবং সে-শান্তি যদি কোথাও মেলে তো তা তোমাদের [illegible] জগতের বাইরে···হিংসা-দ্বেষ-লোভ-অহঙ্কার-ছাড়া [illegible] বনে

বর্ম্মায় যখন বাসা পড়ে

৮।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমার সঙ্গে সঙ্গে কাপালিক এলো অনেক দূর পর্য্যন্ত... আমাকে এগিয়ে দিতে আমাদের ক্যাম্পে।...

ক্যাম্প অবধি এলো না...একটা জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো। বললে—আর আমি যাবো না।...সভ্য-জগতের একজনের সঙ্গে দেখা হওয়াই ভালো...বেশী লোকের সঙ্গে দেখা হলে মন যদি চঞ্চল হয়...সে-চাঞ্চল্যকে আমার ভারী ভয় করে।

আমি বললুম—আপনার কোনো খপর দেবার নেই...সভ্য-জগতে আপনার কোন আত্মীয়-বন্ধুর কাছে?

ম্লান হাসি-মুখে কাপালিক বললে,—না! যা গেছে, তার জন্য আমার মনে ক্ষোভ নেই।

বললুম,—আপনার নাম জানতে পারি? যে-নামে সভ্য সমাজে আপনার পরিচয় ছিল?

কাপালিক বললে,—নাম জেনে কোনো লাভ আছে? আমার নাম বনবাসী।

হাতে হাত রেখে বিদায়-সম্ভাষণ...

তারপর তুজনে সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী।...

এগিয়ে এলুম ক্যাম্পে...খুঁটী খাটিয়ে মশারি-ফেলা সেই ছাউনি!
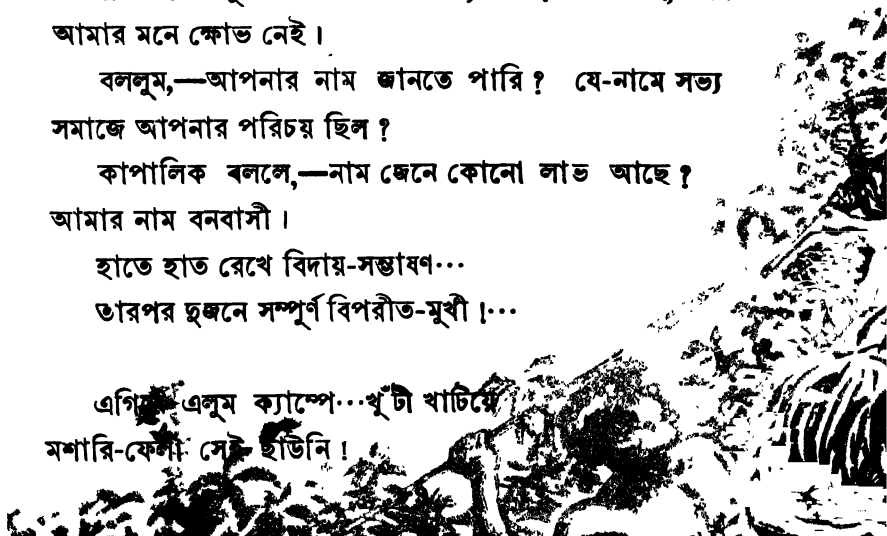
প্রথমেই দেখা মাণকির সঙ্গে
আমাকে দেখে তার কি আনন্দ! মুখে ভাষা ছিল না······অঙ্গে-অঙ্গে বিচিত্র লীলা-ভঙ্গী···তা দেখে বুঝতে বিলম্ব হলো না, মাণকির বুকের উপর থেকে যেন দুশ্চিন্তার পাথর নেমে গেছে···সে খুশী হয়েছে!···

মশারির মধ্যে একটিমাত্র প্রাণী শুধু পড়ে আছে···সাত্যকি! শুনলুম, তার খুব জ্বর। একটা দিন বেহুঁশ ভাবে কেটে গেছে। তার জ্বর···তার উপর আমার উদ্দেশ নেই···দলের সকলে একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে! আমার সন্ধানে বেরিয়েছে প্রভাত আর অনাথ ডাক্তার। মাণকিও খুব ঘুরেছে···আজও সে ওদের সহগামী হচ্ছিল···ওরা প্রবল নিষেধ তুলেছিল।

মাণকিকে রেখে তারা বেরিয়েছে। মাণকিকে বলে গেছে,—তুমি এখানে থেকে সাত্যকিকে চৌকি দেবে···অসুখে কাতর। ওর যদি দরকার হয়···

তাই মাণকি এখানে আছে···পীড়িত সাত্যকির পাহারা-দারী করতে, সেবা-শুশ্রূষা করতে!

বন্ধু-সম্মিলন হলো সন্ধ্যার সময়। এবং সে-রাত্রিটা কাটলো কল্পনা-জল্পনায়। সকালে দেখা গেল, সাত্যকির জ্বর···

বর্মায় যখন বোমা পড়ে

মাথার উপর দিয়ে ঘর্ঘর রবে একখানা প্লেন চলে গেল···কোথায়, কে জানে! জাপানী-প্লেন নয়, বৃটিশ-প্লেন।···হয়তো আর্ত্ত আশ্রয়হীনের সন্ধানে বেরিয়েছে···ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো আমরা কটি প্রাণী বনের বুকে ফুটকি-বিন্দুর মতো পড়ে আছি, আমাদের উপর নজর পড়লো না।

সেদিনও আমরা ছাউনি তুলতে পারলুম না···জ্বর ছাড়লেও সাত্যকির এমন সামর্থ্য নেই যে হাঁটা পায়ে পাড়ি জমাবে!

এখনো তুদিন এখানে থেকে যেতে হবে···দায়ে পড়ে।

খাবার-দাবার ফুরিয়ে এসেছিল···তুশ্চিন্তা জাগলো। মাণকি বললে,—ভয় কি···আমি ফল এনে দেবো···মাছ ধরে দেবো নদী থেকে।

তিনদিনের দিন মাণকি গেল সকালে নদী থেকে মাছ সংগ্রহ করে আনতে। আমরা বসে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অলস জল্পনায় মত্ত হলুম! প্রভাত বললে,—তোমার কাপালিকের মতো আমাদেরো যদি সাত বছর এই বনে থেকে যেতে হয়, তাহলেই তো গেছি! কাপালিক বলেছে, অভিশাপে এ-বন ভরে আছে···কে জানে, মনে-জ্ঞানে আমরা তুরাত্মা নই? সে-অভিশাপ যদি আমাদেরো লাগে?

এ-নিয়ে রঙ্গ-কৌতুকের তুফান তুলেছি···বনের কষ্ট গা-সওয়া হয়ে এসেছে···এমন স[illegible] প্রাণপণে ছুটে মাণকি এসে হাজির [illegible] হাঁপাতে হাঁপাতে ব[illegible]—
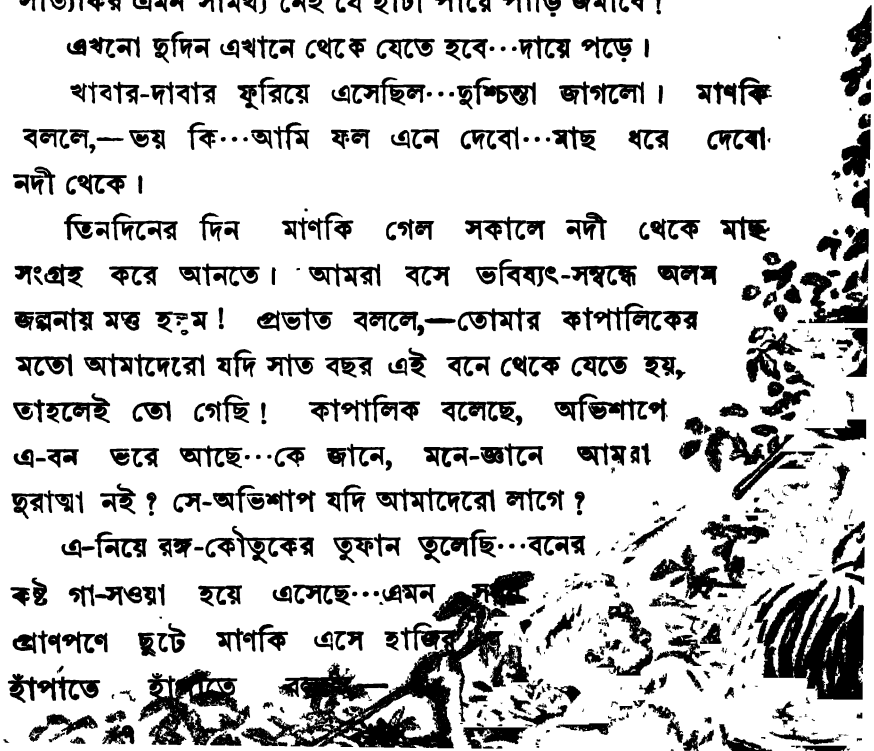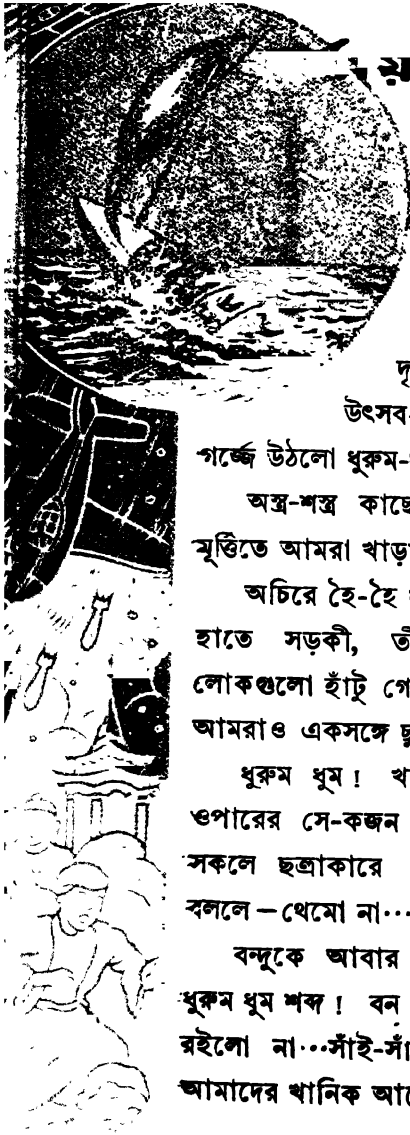
...য় যখন বামা পড়ে।

হাতিয়ার নাও··· ওরা আসছে! আমি তোমাদের সঙ্গে আছি···রাগে ওরা তোমাদের মারবে······আমাকেও ছেড়ে দেবে না! শীগগির···শীগগির!

যেন থিয়েটারের পট-পরিবর্ত্তনের দৃশ্য! রাজপুরীতে নাচে-গানে-গল্পে রঙ্গ-উৎসব-আনন্দ চলেছে···হঠাৎ সেখানে কামান গর্জ্জে উঠলো ধুরুম-ধুম্···ঠিক তেমনি!···

অস্ত্র-শস্ত্র কাছে ছিল···তখনি সে-সব নিয়ে যুদ্ধং দেহি মূর্ত্তিতে আমরা খাড়া হলুম···মাণকি রইলো আমাদের পিছনে।

অচিরে হৈ-হৈ শব্দে নদীর ওপারে উদয় হলো বুনোর দল··· হাতে সড়কী, তীর-ধনুক। আমাদের দেখে সামনের লোকগুলো হাঁটু গেড়ে বসে ধনুকে তীর সংযোজনা করলো। আমরাও একসঙ্গে ছুড়লুম রাইফেল···

ধুরুম ধুম! খানিকটা ধোঁয়া! ধোঁয়া সরে গেলে দেখি, ওপারের সে-কজন ধূল্যবলুণ্ঠিত। তাদের অবস্থা দেখে বাকী সকলে ছত্রাকারে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়লো। মাণকি বললে—থেমো না···চালাও গুলি···আবার···আবার···

বন্দুকে আবার সাড়া জাগলো···ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুরুম ধুম শব্দ! বন কেঁপে উঠলো। বুনোর দলও চুপ করে রইলো না···সাঁই-সাঁই করে পাঁচ-ছটা তীর এসে পড়লো আমাদের খানিক আগে···

অনাথ ডাক্তার বললেন—ভেগে যায় নি। ওরা ভারী জবরদস্ত! তাছাড়া দলের কজন যখন মারা গেছে, তখন সহজে ছাড়বে, সে স্বভাব ওদের নয়···

ঘণ্টাখানেক ধরে বিপর্য্যয় ব্যাপার চললো! যাকে বলে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি! কিন্তু দীর্ঘজীবি হোক এই রাইফেল! এর কাছে অনভ্যস্ত হাতের তীর-ধনুক···আজ তার সব শক্তি হারিয়ে বসেছে! অথচ একদিন ছিল, যে-দিন ঐ তীর-ধনুকই পৃথিবীর বুকে বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছে!

অনাথ ডাক্তার বললেন,—আজকের মতো বুনোরা দিল পৃষ্ঠভঙ্গ।

আমরা বললুম,—কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ হবে না।

মাণকি বললে,—অন্যদিক দিয়ে নদী পার হয়ে ওরা এ আসবে নিশ্চয়···চুপ করে থাকবে না!

আমি বললুম—কিন্তু ক'খানাই বা ঘর দেখেছি! এত লোক আসবে কোথা থেকে?

মাণকি বললে,—ভিতরে গাঁ আছে···গাঁয়ে বহুৎ সর্দ্দার থাকে।

—উপায়?

অনাথ ডাক্তার বললেন—Strategy······না হলে কতদূর পর্য্যন্ত ওরা তাড়া কর[illegible] জানে! একে তো দুর্গম পথ, তার উপ[illegible] মশা আছে, [illegible]-ছাই আছে
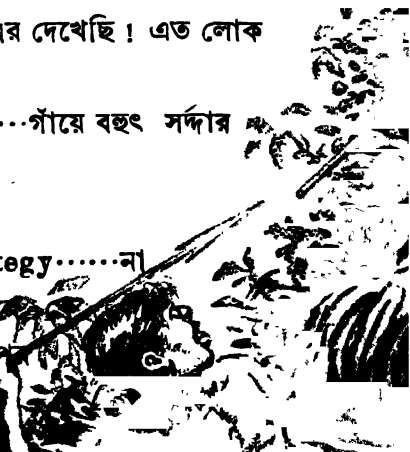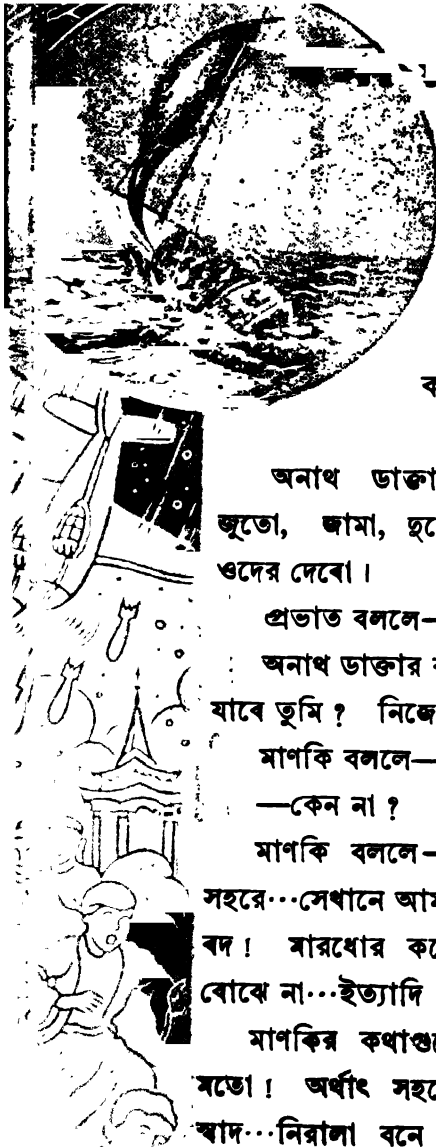
বর্ষার জলে জোঁকের বংশ মাথা
জেগে উঠেছে! সাপ আছে, চ
জানোয়ারেরও অভাব হবে না হয়তে
এ-বনে মৃত্যু নানারূপে বিরাজ কর
তার উপর এখানকার মানুষকে
করলে ফল হবে সাংঘাতিক!

প্রভাত বললে—Strategy মানে?

অনাথ ডাক্তার বললেন,—আমাদের কাছে অ
জুতো, জামা, দুধের টিন, ফলের টিন···এই সব জি
ওদের দেবো।

প্রভাত বললে—আসলে ওদের রাগ মাণকির জন্য···

অনাথ ডাক্তার বললেন—মাণকি···আমাদের সঙ্গে কো
যাবে তুমি? নিজের ঘরে ফিরে যাও।

মাণকি বললে—না···

—কেন না?

মাণকি বললে—বহুৎ রোজ আমি ছিলুম বাঙলা-দে
সহরে···সেখানে আমার বহুৎ আরাম লাগতো! এরা ভা
বদ! মারধোর করে, মুখের পানে তাকায় না···সুখ-দু
বোঝে না···ইত্যাদি

মাণকির কথাগুলো যেন নাটক-নভেলের নায়িকার কথ
মতো! অর্থাৎ সহরে গিয়ে ও পেয়েছে সহরের সভ্যত
স্বাদ···নিরালা বনে একঘেয়ে জীবন ওর অসহ্য বোধ হয়

মনে পড়লো কাপালিকের কথা···সভ্য-সমাজ ছেড়ে সে এই বিজন বনে নিঃসঙ্গ জীবনে পেয়েছে এমন সুখ, এমন শান্তি যে, সভ্য-সমাজে আর ফিরে যেতে চায় না! আর এই বনের মানুষ মাণকি···ও চায় বন ছেড়ে সভ্য-জগতে গিয়ে বাস করতে!

কবিরা সাধে মানুষের চরিত্রকে বিচিত্র বলে গেছেন। মাণকিকে অনেক করে বোঝানো হলো। বললুম—আমরা চলেছি অনিশ্চিতের বুক বয়ে···লক্ষ্যহারা···আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে যদি জড়াও, তোমারও দুর্ভাগ্য সার হবে।··· তার চেয়ে···

অনাথ ডাক্তার বললেন,—তুমি ফিরে না গেলে আমাদের উপর এদের অত্যাচার থামবে না মাণকি···

মাণকি বললে—বেশ, আমি গিয়ে ওদের জিজ্ঞাসা করে আসি···কি ওরা চায়! যতক্ষণ না ফিরবো, তোমরা চলে যাবে না, বলো?

আমরা বললুম—বেশ···আমরা কথা দিচ্ছি।

ঘুরে ঘুরে কোথা দিয়ে মাণকি ওপারে গেল···সেটুকু রহস্য রয়ে গেল আমাদের কাছে!···

আমরা চুপচাপ বসে রইলুম···সতর্ক হয়ে নিশ্চয়···বুনোরা অতর্কিত আক্রমণে বিপন্ন না করে!
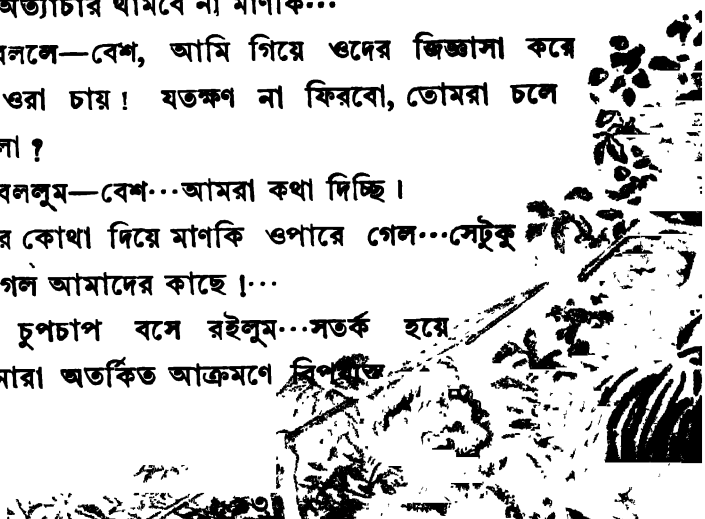
র্মায় যখন বোমা পড়ে
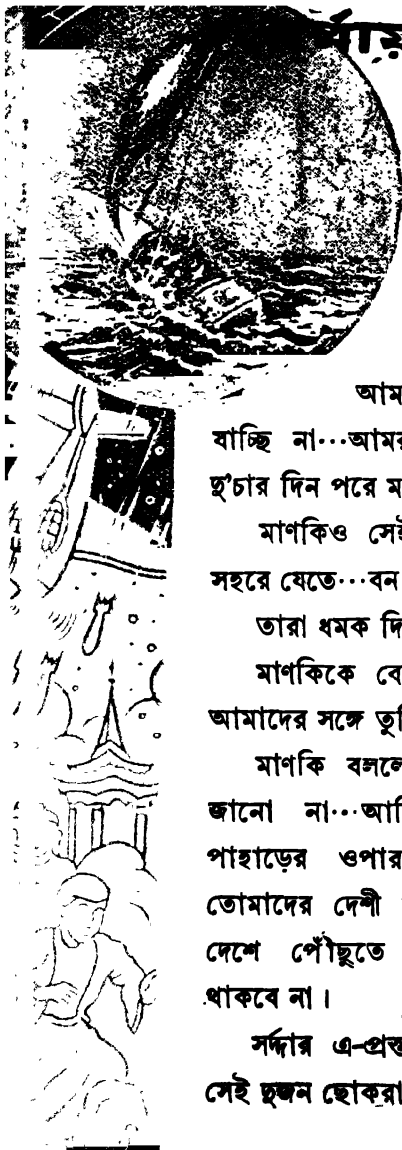
মাণকি ফিরে এলো—তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। একা নয়···তার সঙ্গে সেই সর্দ্দার আর দুজন বুনো ছোকরা এলো।

তারা বললে—মাণকির জন্যই তাদের রাগ···তাদের লোককে আমরা ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিসের অধিকারে!

আমরা তাদের বোঝালুম—আমরা ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না···আমরা তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার দু'চার দিন পরে মাণকি এসে উদয় হয়েছে···

মাণকিও সেই কথা বললে। আরও বললে, মাণকি চায় সহরে যেতে···বন তার ভালো লাগে না।

তারা ধমক দিয়ে বললে—তা হবে না···কভি নেহি!

মাণকিকে বোঝালেন অনাথ ডাক্তার,—লক্ষ্মী মাণকি··· আমাদের সঙ্গে তুমি এসো না!

মাণকি বললে—বেশ···কিন্তু এখানকার কথা তোমরা জানো না···আমি তোমাদের এগিয়ে দেবো সেই কুমান পাহাড়ের ওপার পর্য্যন্ত···তারপর লামু গাঁ। সেখানে তোমাদের দেশী বহুৎ কুলির বাস। লামু থেকে তোমরা দেশে পৌঁছুতে পারবে···পথ হারিয়ে মারা যাবার ভয় থাকবে না।

সর্দ্দার এ-প্রস্তাবে রাজী হলো। মাণকি এবং তার সঙ্গে সেই দুজন ছোকরা থাকবে···সর্দ্দারের নির্দ্দেশ হলো।

বর্মা যখন বামা পড়ি

সর্দ্দার্ আমাদের বললে,—মাণকিকে নিয়ে যাবে না, খবর্দ্দার! মাণকি আমার মেয়ে নয়, ভাগনী……ও ছাড়া আমার বংশে আর কেউ নেই। ও চলে গেলে কাকে নিয়ে এখানে থাকবো?

আমরা বললুম,—তাই হবে।…

সাতদিন পরে আমরা এসে পৌঁছুলুম কুমান পাহাড়ের কোলে—পাহাড়ের চড়াই ভেঙ্গে এপারে। পাহাড়ের কোলে নদী·· নদীতে ডোঙ্গা মিললো। আমাদের ডোঙ্গায় চড়িয়ে দিয়ে মাণকি ডাকলো,—বাবুজী···

আমাদের কাছে টাকা-কড়ি ছিল। মাণকির হাতে আমরা সকলে মিলে গোটাকুড়িক টাকা দিলুম। সে টাকা মাণকি ছুড়ে ফেলে দিলে! দিয়ে বললে,—সহরের জন্য আমার কান্না পাচ্ছে বাবুজী! সেখানে কত কি আছে···এখানে কিছু নেই!

অনাথ ডাক্তার বললেন,—বিপদ কেটে যাক, আবার আমরা ফিরে আসবো। জাপানীদের মেরে হারিয়ে— এখানে এসে আবার আস্তানা পাতবো। ক'দিন বা লাগবে? বড় জোর, দু' বছর দেরী হবে! এই কুমান পাহাড়···এ-পাহাড় টোপকে আবার আসবো তোমাদের গাঁয়ে। তুমি আমার বন্ধু! বন্ধুকে মানুষ ভোলে
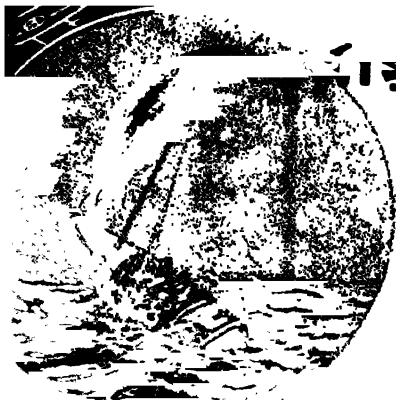
ভোলে না···আমরাও তোমাকে ভুলবো না। এ-যাত্রা লোকালয়ে যে আসতে পেরেছি······বাঁচবার আশা হয়েছে··· সে-শুধু তোমার দয়ায়! তুমি বন্ধু··· আমরা বন্ধু!

অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে মাণকি বললে,—বন্ধু ··

আমাদের ডিঙ্গি দিল ছেড়ে। স্রোতের মুখে ভেসে চললো ডিঙ্গি···কাণে বাজতে লাগলো গানের কলির মতো মাণকির সেই করুণ সুর—বন্ধু···বন্ধু···

লামুতে এসে পৌঁছুলুম। নদী চওড়া নয়। ডিঙ্গি থেকে নেমে ওপারের দিকে চেয়ে দেখি, মাণকি তখনো দাঁড়িয়ে আছে···বিষাদের করুণ ছায়ার মতো!

দিকে দিকে সন্ধ্যার আঁধার নামছিল। সে-আঁধারে অস্পষ্ট-রেখায় দেখা গেল মাণকি দাঁড়িয়ে আছে···নিস্পন্দ নিশ্চল।

পাহাড়ের দেশে সন্ধ্যার আঁধার নামে দ্রুত তালে। নিবিড় আঁধারে মাণকির ছায়া-মূর্ত্তি ক্রমে মিলিয়ে আমাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে গেল!

তারপর···

বীরেশ্বর বললে,—লামুতে কিন্তু নিরাপদ-আশ্রয় মিললো না। দেখি, জাপানী-রাহুর ছায়া লামুর আকাশকে বেশ কালো করে তুলেছে! লোকজনের মনে রীতিমত আতঙ্ক!

বম্বা... যখন বাসা পড়ে

যে-সব বাঙালী চাকরির মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দেশে পাঠাবার উদ্যোগ-আয়োজনে তাঁরা ব্যস্ত! ফৌজ আসছে দলে-দলে···সেই সঙ্গে ট্যাঙ্ক, কামান, প্লেন! মনে পড়লো গীতার সেই প্রথম কটি ছত্র···সমবেতা যুযুৎসবঃ! আমাদের জানা কোনো লোক সেখানে নেই!

লামুতে পৌঁছে সামনে যে হোটেল দেখলুম, ঢুকলুম। ঢুকে প্রথমে স্নান, তারপর কিছু আহার! চারটে বেলায় আমরা ছুটলুম ষ্টেশনে টিকিট কিনতে।

সেখানে ন স্থানং তিল-ধারণং! ছোট্ট লাইন···মাঠ আর জলা ভেঙ্গে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছে। কোথায় চলেছে, জিওগ্রাফি জানিনা! ঠিক করলুম, ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছ থেকে হদিশ নিয়ে টিকিট কিনবো। বলবো, আমাদের ডেষ্টিনেশন্ বেঙ্গল! আমরা বাঙালী!

কিন্তু ষ্টেশনে ঢোকবার পথ পেলুম না। বহু কষ্টে ষ্টাফের এক বাঙালী ভদ্রলোককে পাকড়ালুম। তাঁর শরণ নিতে তিনি বললেন,—পর-পর টিকিট দেওয়া হচ্ছে···আগে থেকে যে যেমন নাম পাঠিয়েছে। আপনারা এখন এসেছেন—এখনি টিকিট পেতে পারেন না।

জিজ্ঞাসা করলুম,—এখন নাম বুক করলে ক··· টিকিট পাবার সম্ভাবনা?

ভদ্রলোক বললেন,—পরশুর ···

নয়।
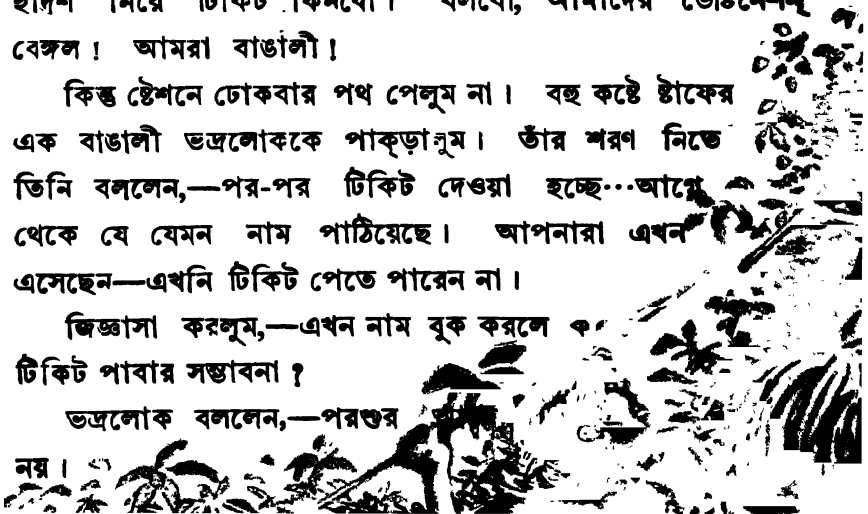
যখন বোমা পড়ে

—ট্রেন কটায় ?

—ট্রেন দু-চার ঘণ্টা পর-পর ছাড়ছে। অর্থাৎ গাড়ী আর এঞ্জিন পাবা মাত্র। দেরী করা হচ্ছে না। এদিক থেকে যেমন লোক চলেছে, তেমনি আবার ওদিক থেকে সোলজার্স আসছে···এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার···সব আসছে। তাছাড়া মালপত্র।

আয়োজনের বিবরণ শুনে মন বলতে লাগলো, কেন পালাচ্ছো ? থেকে যাও···জীবনে এত-বড় যুদ্ধ দেখবার চান্স যদি বা মিললো···হিষ্ট্রীতে যুদ্ধের কথা দু-চার ছত্রই যা পড়েছো···সে-যুদ্ধ আসলে কি বস্তু, দেখবে না ?

প্রভাত বললে,—বনের মধ্যে ছিলুম, যুদ্ধের নামে আতঙ্ক জেগেছিল। মনে হয়েছিল, গাছপালার আড়ালে বোমার আগুনে পুড়ে ছাই হবো তাই পালাবার জন্য অস্থির হয়েছিলুম। এখন লোকালয়ে এসে মনে হচ্ছে, থেকে যাই···ফৌজের সঙ্গে কিম্বা এঞ্জিনীয়ারদের দলে মিশে ! যুদ্ধ দেখবো না ?

ডাক্তার বাবু বললেন,—যুদ্ধ যদি হয়, তাহলে দেখতে রাজী আছি, কিন্তু তা কি হবে ? আমার খালি মনে হচ্ছে, জাপানীগুলোর পাঁয়তাড়া কষা। চুপি চুপি জোগাড়-যন্ত্র সেরে হুড়মুড় করে কেউ যদি ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে তার খানিকটা জিত অসম্ভব নয়। কিন্তু তারপর শেষ রক্ষা ?

ডাক্তার বাবুর কথা শুনে তাঁর পানে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চাইলুম

বর্ম্মায় যখন বোমা পড়ে

…ডাক্তার বাবু বললেন—মানে, তারপর অর্থাৎ ইংরেজ যখন ঐ মার্কিণ জাতের সঙ্গে মিশে একযোগে যুদ্ধং দেহি বলে রুখে উঠবে, তখন?…তোদের তো ঐটুকু মাত্র দেশ…কতই বা লোক-বল? এরা ক-জাতে মিলে তাড়া করে গেলে তাদের পায়ের চাপে যে পিষে মরবি বাপু! কাজেই বুঝছো তো… এ যুদ্ধ ত্বদিনের জন্য! বোমা ফেলে খানিকটা বিপর্য্যয় গোলযোগ বাধাবে! ঐ বোমায় মরতে আমি রাজী নই! যুদ্ধ চলে তো আসা যাবে কোনো একটা দলে যোগ দিয়ে…

ষ্টাফের ভদ্রলোকটিকে ধরে টিকিটের জন্য নাম রেজিষ্ট্রী করে দিলুম। টিকিট পেয়ে যতক্ষণ না ট্রেনে উঠি, ঐ হোটেলেই মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা হলো।

সন্ধ্যার সময় হোটেলের বাহিরে বসে আছি…হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে ইংরেজী ভাষায় ভিক্ষা চাইলো!

ভিখারী বাঙালী। প্রভাত ধমকে উঠলো,—ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। ভিক্ষা চাইতে লজ্জা করছে না? যুদ্ধ বেধেছে…চাকরির এখন অভাব কি!

ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেল…তার ত্ব'চোখের অসহায় করুণ দৃষ্টি আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভিখারীর কথা ভাবতে লাগলুম। ও-মুখ যেন চেনা…কিন্তু কোথায় দেখেছি?

যখন বোম পড়ে

কিছুতে মনে পড়লো না।

তুমি হয়তো আশ্চর্য্য হচ্ছো মুখুয্যে, হঠাৎ ভিখারীর কথা এত ঘটা করে বলবার কারণ কি? কিন্তু আছে কারণ··· শুনলে তুমিও আশ্চর্য্য হবে!

আমি বললুম,—বটে! তার পরিচয় পেয়েছো?

বীরেশ্বর বললে—হ্যাঁ। বলি···সে রাত্রে কিছুতে মনে পড়লো না। পরের দিন চা খেয়ে ষ্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে আছি···দেখছি, কাতারে-কাতারে লোক চলেছে···হুড়োহুড়ি ঠ্যালাঠেলি চেঁচামেচির বিরাম নেই! যারা যাচ্ছে, তাদের চোখে যেমন ভয় আর আতঙ্ক···যারা আসছে তাদেরো তেমনি! জীবন আর মরণের মাঝখানে সেতুর উপর দাঁড়িয়ে যেন সকলের বিদায়-সম্ভাষণ চলেছে!

দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখি, কালকের সেই ভিখারী। গায়ে ছেঁড়া একটা সিল্কের পাঞ্জাবী···হাঁটু ছাড়িয়ে ঝুল···পরণে ময়লা কাপড়···পায়ে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো···এক-কালে হয়তো ক্যাম্বিসের রঙ ছিল সাদা···এখন বাদামী আর কালো রঙের ছোপ লেগে দেখাচ্ছে ঠিক কুষ্ঠরোগীর গায়ের চামড়ার মতো!

তার পানে চাইবামাত্র মনে পড়লো, হুঁ! এ আমাদের সেই তারাপদ! মনে নেই···কলেজে পড়তো তারাপদ?

[illegible] যখন বামা পড়ে

কবিতা লিখতো, গল্প লিখতো···দারুণ অহঙ্কার······বলতো, রবীন্দ্রনাথকে ডিঙ্গিয়ে তার আসন হবে রবীন্দ্রনাথের ওপর!

ডাকলুম,—তারাপদ···

আমার পানে কেমন-এক দৃষ্টিতে সে চাইলো···যেন কে তাকে প্রহার করেছে, মুখ তেমনি ফ্যাঁকাশে!

বললুম,—রবীন্দ্রনাথের আসন টলিয়েছো? কি কাব্য লিখলে হে?···

তার চোখের সে-দৃষ্টি আমার পিঠে যেন চাবুক মারলো! মনে হলো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছি আমি!

তারাপদ বললে, লেখা ছেড়েছে! অনেক লেখা লিখেছিল দেশে থাকতে—কেউ ছাপেনি।···তারপর বেকার···আজ এক বছর চাকরি নিয়ে বর্ম্মায় এসেছিল। একটা কাঠের গোলায় চাকরি মিলেছিল···কিন্তু গোলা গেল পুড়ে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এই লামু। এখানে চাকরি মেলেনি। বাঙালীরা আছে··· তাদের দয়ায় কোনোমতে অন্ন জুটছিল। তাতেও বাদ সাধলো এই যুদ্ধ। সকলেই পরিবার পাঠিয়ে দিচ্ছে···

মনে হলো, কবি-যশের মোহে কত লোক ভবিষ্যৎ খুইয়ে এমন দুর্দ্দশা ভোগ করছে! দু-এক জনের কথা তো জানি।

একখানা পাঁচ-টাকার নোট বার ক[illegible]

তারাপদকে···নোটখানা সে হাত [illegible]

নিলো। [illegible]
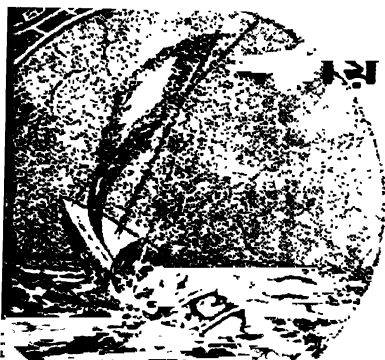
...য় যখন বাম। পড়ে

বুঝলুম, নেশা করে। নোট নিয়ে তারাপদ চলে গেল···ছুটে···হাওয়ার মতো!

তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

তারপর ট্রেন এলো।

এবং যে করে' ট্রেনের কামরায় স্থান সংগ্রহ করেছিলুম···তাকে বলে জীবন-যুদ্ধ! ওদিক থেকে ট্রেন আসছে···যেমন দেখা··· বহুলোক ছুটলো ট্রেনের দিকে। তাদের ভাব-গতিক দেখে মনে হলো যেন ট্রেন লুঠ করতে চলেছে! এবং ট্রেন প্লাটফর্মে দাঁড়াবার আগেই দেখি বহু লোক—যাদের আমরা ছোটলোক বলি, ইতর বলি, শুধু তারাই নয়—ভদ্রলোকও···স্ত্রী এবং পুরুষ···সেই চলন্ত গাড়ীর হাতল ধরবার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছুটলো! আঁকড়া-আকড়ি করে···কেউ আছাড় খেয়ে···কেউ ছিটকে পড়লো! কেউ ফুটবোর্ড অধিকার করলো। ফুটবোর্ড না পেয়ে কত যাত্রী যে ঝুলতে লাগলো হাতল ধরে, সংখ্যা হয় না! ট্রেনের কামরাগুলো তখন লোকে ঠাশা! এদের গাড়ী-চড়ার কসরতি দেখে বুকে কাঁপন জাগলো! প্রাণ বাঁচাবার জন্য মানুষ এমন করে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে পারে···আশ্চর্য্য! কোনো জায়গায় রাশীকৃত লোহা-চূর ফেলে রেখে একটা চুম্বক এনে সামনে ধরলে যেমন লোহার কুচিগুলো বিপর্য্যয় বেগে ছিটকে ছিটকে উঠে চুম্বকের গায়ে লাগে···এদের দেখে মনে হলো, এরা যেন জীবন্ত মানুষ নয়···অমনি লোহার কুচি,—আর ঐ ট্রেনখানা যেন চুম্বক পাথর!

বুঝলুম, আমাদেরও ঐ উপায় অবলম্বন করতে হবে—নচেৎ ট্রেনে চড়তে পারবো না! আমরা করলুম কি, ভিড় ঠেলে
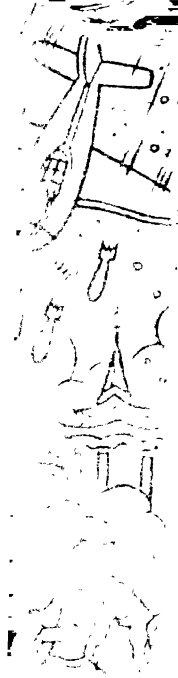
বর্ষায় যখন বন্যা পড়ে

ট্রেনের শেষ-কামরার উদ্দেশ্যে ছুটলুম। তাকে ছোটা বলেনা,—যাই হোক কোনোমতে শেষ-কামরার কাছে এলুম। সে-কামরার যাত্রীরা প্লাটফর্মের দৃশ্য দেখে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে নামতে লাগলো,—আমরা ভিড়ের চাপে এগুতে-এগুতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলুম! এবং ভিড়ের ঠেলায় হুমড়ি খেয়ে কোনমতে জানলার ধারে পৌঁছুলুম! জানলার ধারে ঠাঁই পেয়ে মনে হলো আর যাই হোক, দম্ আটকে কামরার মধ্যে মরবো না···তারপর কখন ট্রেন থেমেছে, এবং আমাদের কামরাখানি লোকে-লোকে ভরে উঠেছে, সে যেন স্বপ্ন!

কামরায় ঠাঁই পেয়ে বহু যাত্রীর খেয়াল হলো, দলের কে এলো, কে-বা পড়ে রইল সন্ধান নেওয়া! চীৎকার স্বরু হলো,—ওরে ও নারাণ তোরা সব উঠতে পেরেছিস তো? ওরে অ হাবু···এ গনশা,···ফকির মিয়া গো···ও···ও···। একজনের খেয়াল হলো, স্ত্রী কোথায় গেল? চেঁচাতে লাগলো স্ত্রীর নাম ধরে'—লছমনিয়া···লছমনিয়া রে-এ-এ···তারপর তার কি ধস্তাধস্তি···নেমে যাবে হারানো স্ত্রীর সন্ধানে!

প্লাটফর্মে অত চীৎকার অত সোরগোল···ট্রেন ছাড়বার পরেও সে গোলমাল চেপে বেচারী স্ত্রী-হারার উচ্চকণ্ঠ--লছমনিয়ারে···কানে এসে লাগলো

'প্যাণ্ডেমোনিয়াম' কথাটা কলেজের কেতাবে পড়েছিলুম, মর্ম্ম ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয়নি,—লামু-ষ্টেশনে বুঝলুম, প্যাণ্ডেমোনিয়াম্ কাকে বলে!

ট্রেন চললো। কামরার ভিতরে বসা-দাঁড়ানো কুণ্ডলী-পাকানো অসংখ্য যাত্রী· তা[illegible] বাহিরে ফুটবোর্ডে একপায়ে-ভর-দি[illegible] দাঁড়ানো, [illegible]

যখন বোম পড়ে

হাজার হাজার যাত্রী! আতঙ্কে ব
ঝুলছিল…ঐ তো একরত্তি এঞ্জিন…ব
… ও পাবে যার জোরে নিরাপ
আস্তানায় আমাদের পৌঁছে দেবে!

ছোটখাট চার-পাঁচটা ষ্টেশন প
হলো…সে সব ষ্টেশনেও কাতারে-কাতা
লোক দাঁড়িয়ে…তাদের মধ্যে কত লো
কি করে কামরার হাতল ধরলো, কি করেই ব
ঢোকবার জায়গা পেলো, জানিনা! যারা উঠলো তাদের চে
দশ-বারোগুণ যাত্রী পড়ে রইলো চোখে-মুখে মরণের ছায়
নিয়ে…সে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার!

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ—কামরায় জায়গা পেলেও বেশী এগুনে
গেল না!

নামতে হলো পথের মধ্যে…এখান থেকে লাইন উড়ে
গেছে জাপানী-বোমার ঘায়ে। তারপর কিভাবে যাত্রা শেষ
হলো ·· simply shocking.

আমি বললুম,—বলো…

বীরেশ্বর বললে,—আজ আর নয়…দু ঘণ্টা ধরে বকছি।
এ-পর্য্যন্ত যা শুনলে, তা আমাদের পলায়ন-কাহিনীর প্রথম
অধ্যায়।… শুনতে চাও, আর-একদিন অবসর-মতো এসে
দ্বিতীয় অধ্যায় বলবো। সে-অধ্যায় আরো ইন্‌টারেষ্টিং।
আজ এইখানেই ইতি করি, বন্ধু।…